

১৯৭১

চুকনগরে গণহত্যা

গ্রন্থনা
হাসিনা আহমেদ
মোঃ সেলিম
মোঃ সালেহ আতহার খান
দিলরুবা বেগম

মুনতাসীর মামুন
সম্পাদিত



১৯৭১
চুকনগরে গণহত্যা

মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত

গ্রন্থনা
হাসিনা আহমেদ ■ মোহাম্মদ সেলিম
মোঃ সালেহ আতহার খান ■ দিলরুবা বেগম

বাংলাদেশ চর্চা
Centre for Bangladesh Studies

বা চ : ২

চুকনগর গণহত্যার ৩০ বছর পূর্তি স্মরণে
প্রথম প্রকাশ
মে ২০০২

প্রকাশক
রেহ্‌না হক
বাংলাদেশ চর্চা
১৫০ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম
(দোতলা) ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
২০/২ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা ১১০০

পরিবেশক
ইউপিএল
রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং
১৪৪ মতিঝিল বা/এ
ঢাকা ১০০০। বাংলাদেশ
E-mail : upl@bangla.net
সুবর্ণ
১৫০ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম
(দোতলা) ঢাকা ১১০০

মূল্য : ১২৫.০০

ISBN 984 606 001 7

CHUKNAGAREY GANAHATYA : 1971 *Genocide at Chuknagar : 1971*
Published by ***Bangladesh Charcha*** (Centre for Bangladesh Studies) 150, Bangabandhu National Stadium (1st floor) Dhaka 1000. Bangladesh. Edited by Muntassir Mamoon.
Price : Tk. 125.00

উৎসর্গ

চুকনগর গণহত্যায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন

সাক্ষাৎকার : সূচিপত্র

ভূমিকা

সাত আট বছর আগে অধ্যাপক সালাহ্উদ্দিন আহমেদ 'তৃণমূল পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ তৈরি করা। প্রকল্পটি সমন্বয় ও পরিচালনার দায়িত্ব ছিল আমার। দু'বছর ধরে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। প্রায় এক হাজার সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছিলো।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দুপুরে উপস্থিত হই চুকনগরে। আগে শুনেছিলাম, চুকনগরে ১৯৭১ সালের ২০মে এক ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিলো। কিন্তু, এই গণহত্যা সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না। গণহত্যা বিষয়ক কোন বইতে বা স্বাধীনতার দলিলপত্রেও চুকনগর প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত। চুকনগর কলেজের অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলামের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। চুকনগর গণহত্যা সম্পর্কে তিনি আমাদের বিস্তারিত জানান। ভদ্রা নদীর তীরে নিয়ে যান। গ্রামের মেঠো পথে হাঁটতে হাঁটতে সেই দিনের ঘটনা বর্ণনা করেন। কিন্তু, গণহত্যার ভয়াবহতা তখনও বুঝতে পারিনি। তবে, ঠিক করেছিলাম কখনও সুযোগ পেলে চুকনগরে এসে গণহত্যার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করবো। অবশ্য আমরা কিছু সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম।

সেই সুযোগ আসে নতুন শতকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন স্থাপিত হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট'। এক ঝাঁক তরুণ নিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছি। মূল উদ্দেশ্য, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ করা।

ইনস্টিটিউটের একটি প্রকল্প ছিল 'ওরাল হিস্ট্রি' বা 'মুখের কথায় ইতিহাস।' এ প্রকল্পের অধীনে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। কোন বিষয়ে ইতিহাস লিখতে গেলে এসব সাক্ষাৎকার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। অন্য একটি প্রকল্প ছিল 'মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প'। এর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে সে স্থানে গিয়ে অবস্থান নেয়া এবং স্থানীয়দের সম্পৃক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ করা। ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নর্স দু'টি প্রকল্পের সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত নেয় চুকনগর গণহত্যার বিবরণ প্রস্তুত করার। এ

কারণে ২০০০ সালের ৮-৯ সেপ্টেম্বর চুকনগর কলেজ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিন ব্যাপী 'মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প'-এর আয়োজন করা হয়। এ ক্যাম্পে ও আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র ও বিভিন্ন পেশার মানুষজন। চুকনগর গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী প্রায় দু'শো জনের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করা হয়। সেসব সাক্ষাৎকার ইন্সটিটিউটের আর্কাইভসে রক্ষিত আছে। একদিক থেকে দেখলে প্রায় এক দশক আগে যে কাজ শুরু করেছিলাম তারই ধারাবাহিকতায়।

২

চুকনগর খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত। খুলনার উত্তরে যশোর ও ফরিদপুর, পূর্বে ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালি, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এখন পাকা সড়ক ধরে অনায়াসে স্বল্প সময়ে চুকনগর যাওয়া সম্ভব। ১৯৭১ সালে তা সম্ভব ছিল না। অধিকাংশ জমি ছিল নিচু, বিল, ডোবায় ভর্তি। তবে, চুকনগর থেকে সাতক্ষীরা সড়ক ধরে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়ার একট পথ আছে। ১৯৭১ সালে এ পথ ধরেই মানুষ বাংলাদেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে যেতে চেয়েছেন। ডুমুরিয়া থানার আটলিয়া ইউনিয়নের চুকনগর বাজারটি তখনও ছিল বেশ পরিচিত। তিনদিকে নদী ঘেরা চুকনগরের বাজার। খুলনা শহর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার পশ্চিমে ভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার সঙ্গে নদী ও সড়ক পথে তুলনামূলক ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য চুকনগর ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হানাদারদের গণহত্যা শুরু হয়। রাজাকার, শান্তি বাহিনী সংগঠিত হওয়ার পর গণহত্যার কার্যক্রম আরো পরিকল্পিতভাবে চলতে থাকে। স্থানীয় বাঙালি ও বিহারী সহযোগীরা হানাদারদের থানা-ইউনিয়ন পর্যায়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে থাকে। প্রধান টার্গেট হয় সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগাররা। খুলনায় এ কার্যক্রম শুরু হয়। এবং এরই সূত্র ধরে চুকনগর গণহত্যা সংঘটিত হয়।

চুকনগর গণহত্যার কারণ কি সুনির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারেনি। তবে, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিভিন্ন বিবরণ থেকে এ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে। খুলনার বিভিন্ন থানায় হানাদারদের সহযোগীরা সাধারণ মানুষজনের ওপর অত্যাচার শুরু করে বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর। ফলে, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে ভিটেমাটি ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন যাবার পথটি ছিল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে চুকনগর আসা। এবং তারপর দালাল অথবা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন কারো সাহায্যে সীমান্তে পৌঁছা। হানাদার ও তাদের সহযোগীদের অত্যাচার বাড়লে, দলে দলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বাটিয়াঘাটা, দাকোপ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট থেকে রওয়ানা দেয়। নদীপথ বেশি কার্যকর হওয়ায় এ পথেই মানুষ এসেছিলো বেশি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, একই

দিন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এতো মানুষ চুকনগরে জমা হলো কীভাবে? এপ্রিল মাসের শেষ দিকে রাজাকার ও হানাদার বাহিনীর সহযোগীদের অগ্নিসংযোগ, অত্যাচার, লুটপাট, নারী নির্যাতন, হত্যা চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করে। স্থানীয় পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও শ্রেণী শত্রু নিধনের নামে একই কাজ শুরু করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ডুমুরিয়া, বাটিয়াঘাটা, দাকোপ, সাতক্ষীরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মানুষ ভারতের পথে রওয়ানা দেয়।

সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় বিভিন্ন দিনে, বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ রওয়ানা হয়ে চুকনগর পৌঁছে। যাদের যাওয়া সম্ভব হয়েছে তারা চলে গেছে। বাকীরা ছিল যাওয়ার অপেক্ষায়। তা'ছাড়া হানাদাররা 'আক্রমণ করতে পারে' কিছু এলাকায় এই আশঙ্কার খবর ছড়িয়ে পড়লে ১৮/১৯ মে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষজন রওয়ানা হয় এবং ২০ তারিখ দেখা যায় চুকনগর এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে।

বেশ কয়েকজন জানিয়েছেন, খেয়াঘাটের জনৈক বিহারী খানের সঙ্গে খেয়া পারাপারের মূল্য নিয়ে কারো কোন বচসা হয়েছিলো। সেই খান 'দেখে নেয়া'র বাসনায় হানাদারদের খবর দিয়েছিলো। হানাদারদের স্থানীয় সহযোগীরাও এতে ইন্ধন যুগিয়েছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ—'মালাউন' বা বিধর্মীদের পাক দেশ থেকে বের করে দেওয়া এবং সম্ভব হলে তাদের টাকা, সোনাদানা লুট করা। এই হচ্ছে চুকনগর গণহত্যার পটভূমি।

২০মে, বৃহস্পতিবার, সকাল থেকেই সবাই যাত্রার আয়োজন করছিলো। অধিকাংশ পরিবারের ইচ্ছা ছিল ১০-১১ টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে রওয়ানা হবে। অন্যদিকে, চাপা আতঙ্কও ছিল খানিকটা। কারণ, বিহারী খানের সঙ্গে বচসা হয়েছিলো। বেলা দশটার দিকে সাতক্ষীরা সড়ক ধরে হানাদারদের দু'টি ট্রাক বর্তমান চুকনগর কলেজের (৭১-এ কলেজ ছিল না) পশ্চিম পাশে কাউতলায় এসে পৌঁছায়। এই এলাকাটুকু তখন পাতখোলা নামে পরিচিত ছিল স্থানীয়দের কাছে। হানাদারদের সংখ্যা বেশি ছিল না। খুব সম্ভব এক প্লাটুন সৈন্য হয়ত এসেছিলো। হালকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ট্রাক থেকে নেমেই তারা গুলি করতে শুরু করে এবং চুকনগর পরিণত হয় এক মৃত নগরীতে।

গণহত্যা সম্পর্কে সব প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য একই রকম। প্রত্যেকেই হানাদার বাহিনীর আগমন ও নির্বিচার হত্যার একই রকম বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণের ডিটেলসে খানিকটা পার্থক্য আছে। একটির পর একটি বিবরণ যখন শুনেছি তখন গণহত্যার স্বরূপটি অনুভব করতে পেরেছি। 'ওরাল হিস্ট্রি' এভাবেই ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে। ভাবতে অবাক লাগে, স্বজন-পরিজন হারিয়ে কীভাবে পরিবারগুলি বেঁচেছিলো! চুকনগরে এই সাক্ষাৎকার শুনতে শুনতে আবেগে আপ্লুত হয়ে জনকণ্ঠের রিপোর্টার ফজলুল বারী জনকণ্ঠে লিখেছিলেন, "লাশের ওপর লাশ, মায়ের কোলে শিশুর লাশ, স্বামীকে বাঁচাতে স্ত্রী জড়িয়ে ধরেছিল। বাবা মেয়েকে

বাঁচাতে জড়িয়ে ধরেছিল। মুহূর্তে সবাই লাশ হয়ে যায়। ভদ্রানদীর পানিতে বয় রক্তের বহর, ভদ্রা নদী হয়ে যায় লাশের নদী। কয়েক ঘন্টা পর, পাকিস্তানীদের গুলির মজুত ফুরিয়ে গেলে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছে।"

চুকনগরে পাকিস্তানী হানাদাররা কত মানুষ খুন করেছে তার সঠিক সংখ্যা কেউ জানাতে পারেনি। রক্ষণশীল হিসাব অনুযায়ী সেদিন একই জায়গায় কমপক্ষে ছয় থেকে দশ হাজার মানুষ হত্যা করা হয়েছিলো। এই হত্যাকান্ড চালাবার মাঝেও হানাদাররা কিছু নারীকে ধর্ষণ করে, কয়েকজনকে ট্রাকে করে তুলেও নিয়ে যায়। হত্যাকান্ডের পর স্থানীয় লোকজন লাশ পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়ে। অধিকাংশ লাশই ভদ্রা নদীতে ফেলে দেয়া হয়। কিছু গণকবরে সমাহিত করা হয়।

৩

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ইতোমধ্যে সহস্রাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর অধিকাংশই স্মৃতিকথা, দিনলিপি, যুদ্ধের বিবরণ প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের, অহংকারের দিকটি যত আলোচিত হয়েছে সে মাত্রায় হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর অত্যাচার, নারী নির্যাতন, গণহত্যার দিকগুলি রয়ে গেছে উপেক্ষিত।

আসলে বাঙালি ভালোবাসে বীরত্বগাথা। এর একটি কারণ বোধহয়, ক্ষুদ্র এক ব-দ্বীপে তার বসবাস। মাত্র কিছুদিন হলো বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। সে দেখেছে আশেপাশে নির্যাতিত, গরিব, ক্ষুদ্র সব মানুষ। চিন্তার জগতটাই তার ছোট। তাই সাহসী কাউকে দেখলেই সে চমৎকৃত হয়। সে সবসময় বীরের কথা বলতে চায়, যদি সে বীর হয় 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল'-এর মতোও। এ যাবত প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বইপত্র দেখলে এ কথাটি আরো স্পষ্ট হবে। শুধু রণগাথা, বীরত্বের ব্যঞ্জনা। না, নির্যাতন, অত্যাচারের কথা তেমন নেই। এ ইঙ্গিতও নেই কোথাও যে, অত্যাচার ও বীরত্বও এই সূত্রে গাথা। মানুষ অত্যাচারিত হয়, নিপীড়িত হয়, বিদ্রোহ করে এবং তার পর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে লড়াই করে। মুক্তিযুদ্ধ কি তাই নয়? পাকিস্তানের কলোনির অধিবাসী হিসাবে বাঙালি অপমানিত, শোষিত হয়েছে, ১৯৭১-এর শুরু থেকে অত্যাচারিত হয়েছে, তারা রুখে দাঁড়িয়েছে অপমানের প্রতিশোধ নিতে। লড়াই করেছে বীরের মতো। তাই শুধু বীরত্ব যদি হয় ইতিহাসের গাঁথা তাহলে পটভূমিকা থাকে অস্পষ্ট, অজানা এবং সেই বীরত্বের ব্যঞ্জনাও হারিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের গাথা কি কম রচিত হয়েছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান বা ইতিহাসে? কিন্তু বীরত্বের গাথা কতটুকু মনে রেখেছে বাঙালি? মনে রাখলেও রেখেছে খুব অস্পষ্টভাবে। স্পষ্টভাবে রাখলে তো বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী রাজাকার হতো না। 'আলবদর মাওলানা' মান্নান বা গোলাম আযম তো প্রকাশ্যে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারতো না। কারণ, এই বীরত্বের পটভূমিকাটি সবসময় স্পষ্ট হয়নি, অনবরত বলা হয়নি এটি নতুন প্রজন্মের কাছে।

তাছাড়া বাঙালির কন্ট্রাডিকশনের আরেকটি দিক উল্লেখ্য। বাঙালি আবার কোনো বীরকে বেশিদিন সহ্য করতে পারে না। প্রথম সুযোগে তাকে ধুলায় ফেলে দিতে বাঙালি কার্পণ্য করে না। এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুব কম জাতিরই আছে। কিন্তু বাঙালি যেহেতু মানুষ এবং মানুষ আর কিছু না হলেও অত্যাচার-অপমানের কথাটা মনে রাখে। বাঙালিরও তাই আর কিছু না হোক অত্যাচারের কথাটা মনে থেকেছে। গ্রামেগঞ্জে ঘুরলে এ কথাটা টের পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ইউরোপের চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে উপন্যাস, গল্প থেকে কবিতা, প্রবন্ধ থেকে গান—সবখানে কি বারবার ঘুরেফিরে আসে না হিটলারের সেই ক্রুর মুখ আর গুলির শব্দ। ইউরোপের শহরে-বন্দরে কি এখনো চোখে পড়ে না ফ্যাসিস্ট বা নাৎসিদের বীভৎসতার স্মারক? এর কারণ, সেখানে বীরত্বের গাথা যেমন রচিত হয়েছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অত্যাচারের গাথাও। এবং তা বর্ণিত হয়েছে প্রবলভাবে, জোরালোভাবে যা এখনো মর্মমূল কাঁপিয়ে দেয়, যে-কারণে এখনো অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নির্মিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় অসামান্য সব চলচ্চিত্র। নির্মিত হয় 'গণহত্যা' জাদুঘর। জেনেশুনে ইউরোপ সে-কথা মনে রেখেছিলো যে—মানুষ সব ভুলতে পারে কিন্তু অত্যাচার-অপমানের কথা ভোলে না।

আমরা আবার অনেক সময় অত্যাচারকে মনে করি অপমান। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক গড়নে এ ধরনের হীনম্মন্যতা সবসময় ছিল এবং আছে। উদাহরণ দেয়া যাক। একজন শিক্ষককে পাঁচজন ছাত্র এসে পিটিয়ে গেলো বা একজন তরুণীকে দু'জন মিলে ধর্ষণ করলো, তাতে ঢিঢি পড়ে গেলো। সমাজ এসব ঘটনাকে ব্যক্তির অপমান হিসাবে চিহ্নিত করে লুকোতে চায়। ঘটনাটা উল্টো করে দেখি না-কেন? পাঁচজন একজনকে পেটালো, যাকে পেটালো তার অপমান হয় না, বরং ভীরুতা প্রমাণিত হয় পাঁচজনের এবং সেই ভীরুতা হলো অপমান। দু'জন এক তরুণীকে ধর্ষণ করলে তরুণীটি কেন অপমানিত হবে? অপমানিত হবে যারা তাকে রক্ষা করতে পারেনি, অর্থাৎ আশেপাশের মানুষ, পাড়া প্রতিবেশি, সমাজ। কারণ, তাদের ভীরুতার কারণেই তরুণীটি ধর্ষিত হয়েছে। অপমানিত হবে সেইসব পরিবার যেসব পরিবারে ধর্ষকরা বড় হয়েছে, কিন্তু মানুষ হয়নি। কারণ, সেইসব পরিবার তাদের শেখায়নি সভ্য সমাজে কীভাবে বসবাস করতে হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব আর অহংকারের ঘটনা প্রবাহ আমাদের মধ্যে আত্মশ্লাঘার সঞ্চার করে নিশ্চিতভাবে কিন্তু অপমানের বা নির্যাতনের ঘটনার আবেদনও কিছুমাত্র কম নয়। বরং অপমানের ঘটনা জাতির অনুভূতিতে যে গভীর ক্ষত এবং তা যে সংহতি গড়ে তুলতে পারে, তা গৌরবের আনন্দ দিয়ে সম্ভব নাও হতে পারে। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধের অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত বা অনালোচিত বিষয়ের উপাত্ত সংগ্রহে মনোনিবেশ করা দরকার। মুক্তিযুদ্ধের কম আলোচিত দিকগুলির একটি হচ্ছে গণহত্যা। পাকবাহিনী একাত্তরে

শহর থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত অগণিত গণহত্যা চালায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব গণহত্যার শিকার নিম্নবর্ণের মানুষ যাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, তারা ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদানের উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় না। ওয়াহিদুল হক 'জাহানারা ইমাম স্মারক' বক্তৃতায় যথার্থই বলেছেন যে, স্বাধীনতার চেতনার মধ্যে 'গণহত্যার চেতনা' প্রধান, "গণহত্যাকে, ত্রিশ লক্ষের বলিকে প্রায় চার লক্ষ বাঙালি নারীর সম্ভ্রম আহুতিকে ভুলতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কিছুই বাকি থাকে না। মুক্তিযুদ্ধের আদিতে আরম্ভ এই দিনে গড় দশ হাজার বাঙালি নিধনের নিরন্তর মোচ্ছব, একে ভুলিয়ে দিয়েই আরম্ভ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উৎসাধন। ... একমাত্র গণহত্যার চেতনাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিকষিত হেমে পরিণত করতে পারে।

এ কারণে আমরা ছুটে গেছি বারবার চুকনগর। আগেই উল্লেখ করেছি গণহত্যার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি ওরাল হিস্ট্রি পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি সাধারণত ব্যবহৃত হয়। প্রথমত: ব্যক্তিকেন্দ্রিক, দ্বিতীয়ত: ঘটনাকেন্দ্রিক। এখানে আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই গ্রহণ করেছি। চুকনগর গণহত্যার বিষয়টি সাধারণ মানুষ কীভাবে দেখেছেন, গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী, আহত হয়ে দৈবাৎ প্রাণে বেঁচে গেছেন, শহীদ পরিবারের সদস্য এ ধরনের প্রায় দুশো নারী পুরুষের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে। যাঁরা গ্রন্থনা করেছেন এ সংকলন তাঁরা নিজেরাও আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন, নোট নিয়েছিলেন এবং ইন্সটিটিউটের সংগৃহীত উপাদান পরীক্ষা করে ৯০টি সাক্ষাৎকার সংকলন করেছেন। *"এবং এটাই প্রমাণিত হয়েছে এই গবেষণায় যে চুকনগরেই বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গণহত্যাটি ঘটিয়েছিলো পাক বাহিনী। একটি এলাকায় এত কম সময়ে এত মানুষ আর হত্যা করা হয়নি।"*

৪

সাক্ষাৎকারগুলি পড়লে দেখা যাবে কী নিষ্ঠুরতায় পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা মানুষকে হত্যা করেছিলো। যারা বেঁচেছিলেন তারা নিয়তি মেনে নিয়েছেন, প্রিয়জনদের হারিয়ে, অসম্ভব দৃঢ়তায় সেই শোক কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা ফিরে গেছেন নিজ নিজ এলাকায়। অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলো। কেউ তাদের দিকে সহানুভূতি বা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। একমাত্র বঙ্গবন্ধু সরকার তাদের সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলো। ব্যাস ঐ পর্যন্তই। কিন্তু, তা নিয়ে কোন অভিযোগ করেনি এই পরিবারগুলি। হানাদার বাহিনীর সহযোগীরা তাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে, কেউ কেউ বেঁচে আছে এখনও। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি একবাক্যে শুধু বলেছে, তারা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চায়। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো।

বেশ কয়েক বছর আগে পাকিস্তান-বাংলাদেশ ক্রিকেট ম্যাচের সময় চাঁটগায় খুব হইচই। মুক্তিযুদ্ধের বই সম্পর্কিত এক অনুষ্ঠানে আমাকে বলছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, 'ঘটনাটি অবশ্য বেশ আগের। রিকশায় যাচ্ছি। রিকশাঅলা বলল, পাকিস্তানিগো লয়ে এত হইচই। তারা কি অত্যাচার করছে তা আমাগো গ্রামের গাছের পাতাও সাক্ষী দিবো।' স্বাধীনতার পর পর ক্রিকেট নিয়ে হৈচৈয়ের দৃশ্যটি দৃষ্টিকটু লেগেছে, আমরা যাদের অশিক্ষিত বলি, সে রিকশাঅলার।

যে পেরিয়েছে ঐ সময় এবং এখনো তীব্রভাবে অনুভব করে সে সময় তার পক্ষেই এ ধরনের মন্তব্য সম্ভব। এটি বোধের ব্যাপার। *অসউইৎজের* কথা এখনো বলা হয়। সারা বিশ্বের লাখ লাখ লোক এখনো স্মরণ করে সেই গণহত্যার কথা। অনেক বিষয় নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু *অসউইৎজ* বা এ ধরনের কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক নেই, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আছে। আছে বললে বোধহয় ঠিক হবে না, একে সুকৌশলে বিতর্কিত করে তোলা হয়েছে। আমরা জোরালো প্রতিবাদ জানাই নি। ফলে একটি প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের পুরো বিষয়টিই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যখন পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি শুরু হয়েছে তখন আমরা এর প্রতিবাদ করিনি কিন্তু 'মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ' করে মুখে ফেনা তুলেছি। অথচ, ঐ যে রিকশাঅলা যার গ্রামের গাছের পাতাও সাক্ষী দেবে হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের সে কিন্তু বিস্মিত হয়েছে পাকিস্তানিদের নিয়ে মাতামাতি করায়। তাই প্রশ্নটি করেছে। এখনো স্পষ্ট মনে আছে, শহীদদের রক্তের দাগ শুকোতে না শুকোতে জুলফিকার আলী ভুট্টো এসেছিলেন ঢাকায়। ঢাকা শহরের মানুষজন হর্ষোৎফুল্লভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। এই হলো বাঙালির বোধ!

এ পরিপ্রেক্ষিতেই সিভিল সমাজ থেকে দেশীয় ও বিদেশী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি তোলা হয়েছে। কিন্তু, আশ্চর্য হলেও সত্যি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারতো হয়-ই নি বরং তারা রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। ফলে অনিবার্যভাবেই চলে আসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গ। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা দেশের অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড, লুট, ধর্ষণ বা বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত ছিল তারাই যুদ্ধাপরাধী। হানাদারবাহিনীর নীতিনির্ধারক বা যারা এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত তারাও যুদ্ধাপরাধী। স্থানীয় যেসব অধিবাসী এসব কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছে তারাও যুদ্ধাপরাধী।

এ ধরনের মুক্তিসংগ্রামের পর বা যুদ্ধের পর সবসময়ই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে। বাংলাদেশেও হওয়ার কথা ছিল। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জে এন দীক্ষিত জানিয়েছেন, হানাদারবাহিনীর ৪০০ জনকে যুদ্ধাপরাধের জন্য শনাক্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু ১৯৭২-এর মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান এ সংখ্যা হ্রাস করে ১৯৫ এবং তারপর তা ১১৮তে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই ১১৮ জনের বিচারের জন্যও

বাংলাদেশ সরকার মামলা তৈরি করতে পারে নি। তাঁর মতে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো গোপন সমঝোতা হয়েছিলো কি না কে জানে? নাকি বাংলাদেশ সরকার আসলেই যুদ্ধাপরাধের প্রমাণাদি যোগাড় করতে পারে নি। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ নিঃসন্দেহ ছিল যে, যুদ্ধাপরাধ হয়েছে।

তবে দীক্ষিত এও জানিয়েছেন যে, যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট চাপ ছিল। ভারতও তা চেয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে প্রত্যর্পণে সম্মতি দিয়েছিলেন। এবং দীক্ষিত মনে করেন, সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। মুজিব হাকসারকে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা মুশকিল এবং তিনি এ কারণে সময় ও এনার্জি নষ্ট করতে চান না। দীক্ষিতের মতে—"The substantative motivation for Mujibs decision might have been his long-term strategy of not doing any thing which would prevent recognition of Bangladesh by Pakistan and other Islami countries. In the larger interest of peace and normalcy in the sub-continent Mujibur Rahman's approach was valid." কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে কি প্রার্থিত সেই 'stability' এসেছে? না উপমহাদেশে সামগ্রিকভাবে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরেছে? বরং বলা যেতে পারে, যুদ্ধাপরাধের বিচার না হওয়ার কারণে পাকিস্তানি জান্তা সাহসী হয়ে উঠেছে এবং নিজেদের দেশে নিজেদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য আফগানিস্তানের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। তারপর আবার কাশ্মীরেও। বাংলাদেশেও একইভাবে, বাঙালি যুদ্ধাপরাধীরা দেশের শান্তি, স্বাভাবিকতা বিনষ্টে তৎপর হয়েছে এবং তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সম্প্রতি মিরপুরে দু'টি বধ্যভূমি খনন করা হয়েছে এবং তা থেকে নিহত মানুষের হাড়গোড়, মাথার খুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। এরকম আরও বেশ কিছু বধ্যভূমি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ফলে যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি আমাদের কাছে আবার নতুনভাবে ফিরে এসেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি আরো জোরালো হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির প্রাক্তন সভাপতি অ্যাডভোকেট শফিক আহমদ বলেছেন, প্রচলিত যে-আইন আছে তা দিয়েই যুদ্ধাপরাধের বিচার হতে পারে। কিন্তু কোনো সরকার তাতে আগ্রহী হয়নি, হবে কি না সন্দেহ।

ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা পিএন হাকসার শাহরিয়ার কবিরকে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধের বিচার বাংলাদেশেই করতে হবে। এটাই নিয়ম। কিন্তু সে 'নিয়ম' আর এখন নেই। এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আন্তর্জাতিক আদালতেও হতে পারে রোম চুক্তি অনুযায়ী। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন নাগরিক ফোরামগুলোর উচিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হওয়া, আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে সে-দাবি উত্থাপন। যুদ্ধাপরাধীরা এ দেশে বসবাস করার কারণে আজ রাজনীতি, সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। এর ফলে সমাজের একটি অংশ

(মানুষ) যে যুদ্ধাপরাধী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠবে না তার গ্যারান্টি কী? এবং তা হয়ে উঠলে কি দেশ ও জাতির জন্য বিষয়টি মঙ্গলজনক হবে?

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, বিচারের অনেক ধারণাও চ্যালেঞ্জ করা উচিত। জনসমক্ষে যে-অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় যার বিবরণ ছাপা হয়েছে তার আবার সাক্ষ্যপ্রমাণ কী? আইন মানুষের সৃষ্টি, মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের ফ্রেমে নিয়ে আসার জন্য। যে-আইনে বিচার পাওয়া যায় না সে-আইন আবার কিসের আইন?

৫

অনেকে বলেন, কেন আপনারা এখনো এসব বিষয়ে লেখালেখি করেন? এত বছর পর কে আবার রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী প্রসঙ্গ নিয়ে মাতামাতি করেন? পুরনো ক্ষত জাগিয়ে লাভ কী? আপনারা ক'জন এগুলো করে নিজেদেরও বিপদাপন্ন করছেন। তাছাড়া রাজনীতির এমন অবস্থা হয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধের কথা যিনি বলেন, তাঁকেই অভিধা দেয়া হয় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসেবে।

আমি জানি না, রাজনৈতিক দলগুলো এসব বিষয় নিয়ে ভাবে কি না বা কেয়ার করে কি না। আমি তা জানতেও চাই না। কিন্তু আমি কেয়ার করি। আমরা যাঁরা লিখছি তাঁরা কেয়ার করি, যাঁরা এ লেখা পড়ছেন তাঁরা কেয়ার করেন। অজস্র মানুষ আছেন বাংলাদেশে যাঁরা কেয়ার করেন, হয়ত প্রকাশ্যে সে-কথা বলেন না বা মিটিং-মিছিলে আসেন না। এ প্রসঙ্গে তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদের চলচ্চিত্র 'মুক্তির কথা' মনে পড়ছে। সেখানে সামান্য এক মানুষের জবানবন্দি বিধৃত হয়েছে। তাঁর গ্রামে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে এক রাজাকার। সে মানুষ বলছেন, যদি আমরা রাজাকার নির্বাচিত করে থাকি তাহলে আমরা ৯০ ভাগই তো রাজাকার হয়ে গেছি। কুত্তার মতো হয়ে গেছি, না হলে রাজাকার চেয়ারম্যান বানাই!

এ ধরনের মনোভাব নিয়ে অজস্র মানুষ বসবাস করছেন। যদি সে সংখ্যা অজস্র না-ও হয়, তাহলেও অন্তত আমরা ১০০ জন হলেও কেয়ার করি। এবং বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসাবে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারাবদ্ধ একজন হিসাবে, ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসাবে, একজন লেখক হিসাবে আমি কেয়ার করি। তাই যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই। এবং একারণেই এ সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে সম্পাদনা করেছি। যদি কখনও এ দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয় তা'হলে যেন এদের বক্তব্যকে সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

শুধু তাই নয়, আমি এও মনে করি, আমাদের এসব কথা বলে যেতে হবে। আপনাকেও বলতে হবে আপনার সন্তানদের। এসব কথা সোনালি শস্যের মতো বেড়ে উঠবে, ঘিরে ধরবে একসময় নতুন প্রজন্মকে। মনে করিয়ে দেবে তাদের, যখন আমরা থাকব না, যে স্বাধীনতা চার অক্ষরের একটি শব্দমাত্র নয়। মনে করিয়ে দেবে তাদের, কিভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম।

সাক্ষাৎকারগুলি এখানে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারিরা প্রথমে কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছেন যাতে গণহত্যা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু জানা যায়। এক্ষেত্রে সব সময় সফল হওয়া গেছে তা বলা যাবে না। যে কারণে অনেকের পিতার নাম, বয়স, পূর্ণ ঠিকানা যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। সাক্ষাৎকার গ্রহণে নির্ধারিত প্রশ্নমালা অনুসরণের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারীগণ সমান মাত্রায় সচেতন ছিলেন না।

এ গ্রন্থের চারজন রচয়িতা (বা যাঁরা গ্রন্থনা করেছেন) সেই সব সাক্ষাৎকার এবং নিজেদের নেয়া নোটের ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারীদের বক্তব্যের মূল বিষয়টি তুলে ধরেছেন সাক্ষাৎকার প্রদানকারির বক্তব্য অনুসরণ করে। এবং প্রত্যেকের বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য তাদের ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দও ব্যবহার করেছেন। এসব বক্তব্যে গ্রন্থনাকারিদের কোন বক্তব্য নেই। সে জন্যই সব বক্তব্য প্রথম পুরুষে দেয়া। গ্রন্থনাকারিদের উদ্দেশ্য চুকনগর গণহত্যার ইতিহাস বিবৃত করা নয় বরং এই গণহত্যা বিষয়ে দালিলিক প্রমাণসহ সাক্ষ্যপ্রমাণ তুলে ধরা। এ ধরনের প্রচেষ্টা গত ত্রিশবছরে এই প্রথম। সে কারণে, অবশ্যই তারা শুধু প্রশংসার যোগ্য নয়, পথিকৃত হিসেবে তাঁদের জানাই অভিনন্দন।

হাসিনা, সেলিম, আতাহার ও দিলরুবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। চাকুরিসূত্রে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় থাকলেও কাজের সুবাদে একটা যোগাযোগ ছিল। চুকনগরের গণহত্যার বিবরণ সংগ্রহের সময়ই তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয় এ ধরনের একটি সংকলন প্রকাশের। সাগ্রহে তাঁরা সম্মতি জানায়। এবং তাঁদের চেষ্টায়ই গ্রন্থের ৯০টি সাক্ষাৎকার সংকলিত হয়েছে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারিদের আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন সালেহ আতাহার খান ও রফিকুল আকবর।

মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাম্মানিক পরিচালক থাকার কারণেই চুকনগরে মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প করা সম্ভব হয়েছিলো। এবং এক বিশাল অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছিলাম। এ কারণে ইনস্টিটিউটের বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেসময় সব রকমের সহায়তা করেছিলেন। সেজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাছাড়া অন্য আরো অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতাও ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বন্ধু আহমেদ মাহফুজুল হক এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। আমি তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

মুনতাসীর মামুন

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে, ২০০২

নিবেদন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। গণমানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অবদানই মুক্তিযুদ্ধকে সফল করেছিল। আমাদের রয়েছে যুদ্ধের করুণ এবং দীপ্র অভিজ্ঞতা। অথচ গত তিনদশকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সাধারণ মানুষের অবদানের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়নি। প্রথাগত ঐতিহাসিক ও গবেষকদের হাতে এ সংক্রান্ত উপাদানের অভাববোধ বেশ প্রকট। এই প্রেক্ষাপটে তৃণমূল পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের উপাদান সংগ্রহ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প'। খুব কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের মত বিশাল ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পেয়ে আমরা ক'জন প্রচণ্ড উত্তেজনা, আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে এই মহতী আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একাত্তরে পাক বাহিনীর হাতে সমগ্র বাংলাদেশ পরিণত হয়েছিল এক বধ্যভূমিতে। খুলনার চুকনগরে সম্ভবতঃ বাংলাদেশের বৃহত্তম গণহত্যাটি সংগঠিত হয়। চুকনগর কলেজ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত দু'দিনের 'মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে' নানা বয়সী নারী-পুরুষ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। সাক্ষাৎপ্রদানকারী কেউ আপনজন হারিয়েছে, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, কেউবা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। সেখানে স্বতঃ প্রণোদিত হয়েই আমরা নানাজনের আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার নিয়েছি। কখনো নিজে, কখনো অন্য সাক্ষাৎগ্রহণকারীর পাশে বসে সাক্ষাৎ প্রদানকারীর বক্তব্য, আলোচনা শুনেছি, নোট নিয়েছি গভীর মমতা ও আগ্রহ ভরে। একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার আলোকে ওরাল হিস্ট্রি পদ্ধতি অনুসরণ করে এর আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা বজায় থাকেনি। কেন না সে এক বেদনাঘন, আবেগময় পরিবেশ। হৃদয় ভারাক্রান্ত করে তোলে।

সম্প্রতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন ক্যাম্পকালীন প্রতিশ্রুত গণহত্যার বিবরণ সংগ্রহ করে তার একটি সংকলন প্রকাশের। ফলে অধ্যাপক মামুনের উৎসাহ ও পরামর্শে আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত নোট, সে সময়ে

নেয়া ইনস্টিটিউটের আরকাইভে রক্ষিত দুই শতাধিক সাক্ষাৎকার হতে বাছাইকৃত একশো সাতাশটি সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। সম্পাদক তার বিবেচনায় নব্বইটি সাক্ষাৎকার বাছাই করে তা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বলা যায় দু'টো কারণে আমরা এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহবোধ করেছি। প্রথমত: যাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি-তাদের প্রতি এক ধরনের ঋণ স্বীকার করা। দ্বিতীয়ত: কিছু দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করা। মানবাধিকার-এর বিরুদ্ধে অপরাধ যুদ্ধ সৃষ্ট গণহত্যার মত বিষয়টিকে বিচারের সামনে নিয়ে আসা। গণহত্যার প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রের অভাব যা অপরাধীদের ক্রমশ বিস্মৃতির আড়ালে আশ্রয় নিতে সহায়তা করছে। এই অপরাধীদের বিচার আয়োজনে একটি প্রতিবন্ধকতা হলো দালিলিক প্রমাণের অভাব। সুতরাং চুকনগর গণহত্যার শিকার ক্ষতিগ্রস্থ, শহীদ পরিবারের সদস্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ, সাক্ষ্য দালিলিক প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায় বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। এ গ্রন্থের পরিপূরক হিসেবে গণমাধ্যমে প্রকাশিত চুকনগর : মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প সংক্রান্ত খবরাখবর পরিশিষ্টে সংযোজন করে দেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে ও সংকলন গ্রন্থনায় আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের উদার সাহায্য-সহযোগিতা, পরামর্শ পেয়েছি। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশেষভাবে ঋণী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষে কাছে। তাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।

ঢাকা
মে ২০০২

হাসিনা আহমেদ
মোহাম্মদ সেলিম
মোঃ সালেহ আতহার খান
দিলরুবা বেগম

১৯৭১
চুকনগরে গণহত্যা



পূর্ণ চন্দ্র রায়
পিতা : মৃত প্রসন্ন কুমার রায়
বয়স : ৮০
পেশা : কৃষি
গ্রাম : বয়ার গঙ্গা
ডাকঘর : উত্তর বয়ার গঙ্গা
থানা : বটিয়াঘাটা।

২৫শে মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঢাকা আক্রমণের খবর রেডিওতে শুনে আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। প্রতিদিন রেডিওতে শুনতাম। আশে-পাশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করতাম। মানুষজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে বৈশাখ মাসের দিকে জলমার হাই স্কুলে পাকবাহিনী গুলি করে দালান-কোঠা ধ্বংস করে দেয়। এই ঘটনার পর ডুমুরিয়া থানার রংপুর, শাহপুরসহ বিভিন্ন গ্রামের বহু লোক ভারতে চলে যায়। এর ফলে আমরা আরও ভীত হয়ে পড়ি। আমিও সপরিবারে ভারত যাবার সিদ্ধান্ত নেই।

রাতের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে বাড়ি থেকে বের হই। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে সেদিন ছিল মঙ্গলবার। ডুমুরিয়া থানার ঝাপলা গ্রামে রাত কাটালাম। পরদিন সকালে আবার হাঁটা শুরু করলাম। বুধবার রাতে খড়িবুনিয়ায় ছিলাম। রাতে খড়িবুনিয়ায় রান্না করে খাই। পরদিন সকালে রান্না করে কিছু খেয়ে নিলাম কারণ কখন খাবার জুটবে তার কোন ঠিক নেই। খড়িবুনিয়া থেকে নৌকায় করে জ্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচ তারিখে বৃহস্পতিবার সকালে চুকনগর এসে পৌঁছাই। লোকজনের মধ্যে একটা ভয় ভয় ভাব দেখতে পেলাম। কেউ কেউ বললো, এখানে গুলি হতে পারে। চারদিকে চাপা আতঙ্ক।

নৌকা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। আশে-পাশের বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষ চুকনগর বাজারের বিভিন্ন দোকান-পাট খোলা প্রান্তরে সাময়িক আশ্রয় নেয়। বেলা এগারোটার দিকে চুকনগরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে গুলির আওয়াজ আসে। কেউ বলছে পাকবাহিনী, কেউ বলছে মুক্তিবাহিনী গুলি করছে। ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না, কি করবো। কিন্তু গুলির শব্দ যখন ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে তখন আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারলাম না। আমরা নদীর ওপাড়ে যাবার জন্য তৈরি হই। বড়দা আর আমার এক খুড়তুতো ভাই বললো, "আমরা তো বুড়ো মানুষ, মারে তো যুবকদের আমাগের মারবে না।" এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে তারা রয়ে গেলেন। আমি ছেলে-মেয়ে সহ নদীর গর্তের মধ্যে লুকালাম। যদিও জানতাম যে জ্যৈষ্ঠ মাসে লোনার সময়ে নদীতে কুমীর থাকে। প্রাণের ভয়ে আর কোন বিকল্প চিন্তা মাথায় আসেনি। এই অবস্থায় শুনলাম নদীতে গুলি করতে করতে পাকবাহিনী এগিয়ে আসছে। বুঝলাম এখানে থাকলে গুলি খেতে হবে। তখন নৌকা নিয়ে নদীর উত্তর পাড়ে গিয়ে নামলাম। সংবাদ পেলাম

ডাঙ্গা দিয়ে আসছে গুলি করতে করতে। তখন আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার মত চলে যেতে লাগলাম। বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে গেলাম। "ঈশ্বরের কি করুণা সে কাঁটা আমাদের পায়ে ফুটলো না। গায়ে লাগলো না। মানুষের নির্মম ব্যবহার তবু প্রকৃতির যে দান সে দানে আমাদের কোন জায়গায় ব্যথা লাগলো না।" এই কাঁটার আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চুকনগরের উত্তর পাশে ডেরচিতে গিয়ে স্নান-টান করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। একজন এসে জানালো যে আমার দাদা পাকবাহিনীর গুলিতে মারা গেছেন। দাদার মৃত্যু সংবাদ শুনে ঠিক করলাম যে একবার অন্তত লাশটা দেখতে যাব। "এ দৃশ্য জীবনে কোনদিন দেখি নাই। গুলি খেয়ে রক্তের স্রোত বয়ে যায় সেই রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আর মানুষ, কেউ হাত নাইড়ছে কেউ মাথা নাইড়ছে কেউ মুখ মেইলছে। এরকম করতিছে। তা আমি তখন ঐ একেকটা লোকের উপরদে ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে ঐ আমি সেই খানে যেইয়ে দেখি, আমার ঐ দাদা খুড়তুতো ভাই একজন আর আমার সহদোর দাদা উনার ঐ গুলি ঠিকই বুকে লাগছে।"

যেদিকে তাকাই কেবল লাশ, কত মানুষ সেদিন পাকবাহিনী হত্যা করেছে, তার হিসাব দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কয়েক ঘন্টার ভেতরে অগণিত মানুষ লাশে পরিণত হয়। "আমি যখন খেয়া পার হই তখন একটা মেয়ে ছেলে (মহিলা), সে চিৎকার করে কানছে। আমি বলছি মা কানছো কেন? তা বললো আমার স্বামীকে এরকম বুকে জড়ায়ে ধরেছিলাম। ওরা এসে আমার স্বামীকে ছাড়ায় নিয়ে স্বামীর বুকে রোল ধরে গুলি করেছে। ... ছোট ছোট বাচ্চা ঐরম মাকে মায়ের উপরে মরা মানুষের বুকের উপরে দুধ খাচ্ছে। আর মা মরে গেছে।" চুকনগর হত্যাকাণ্ডের পর আরও ৪/৫ দিন দেশে ছিলাম। টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় সবই চুকনগরে হারিয়েছি। ভিক্ষার ওপর জীবন ধারণ করেছি। এই কয়দিন আত্মীয়স্বজনের খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করেছি। কারণ ভারতে চলে গেলে আবার ফিরে আসতে পারবো কিনা তা তো জানতাম না। নদীর তীরে ঘুরে বেড়াই। "চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীতে শুনতাম মৃতদেহ শ্যাওলার মত ভেসে যাচ্ছে। আর এইখানেও দেখলাম মৃতদেহ জোয়ারে মানে জোয়ারে চলে যায়। ভাটায় নেমে আসে এবং এগুলো নদীর কিনারায় ঐ চরের উপর লেগে যায়।" লাশের গন্ধে গ্রামে বসবাস অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাদের পরিবারের সবাই ভারতে চলে গেলাম।

দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের গ্রামের লোকজন পৌষ-মাঘ মাসে ফিরে আসে ভারত থেকে। আমি অসুস্থ ছিলাম, তাই ফাল্গুন মাসে আসি। চুকনগর অবিচার অত্যাচারের বিচার হওয়া দরকার।



নাম : হরিপদ মণ্ডল
বয়স : ৭৮/৭৯
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : শিবনগর
ডাকঘর : শিবনগর
ইউনিয়ন : ১৪ নং মাগুরখালি
থানা : ডুমুরিয়া।

৭১ সালে আমি একজন কৃষক। যুদ্ধ সম্পর্কে আমার তেমন একটা ধারণা ছিল না। পাক সৈন্যরা এ এলাকায় এসেছে, গোলাগুলি করছে, এ দেখে লোকজন নিজ বাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যেতে লাগলো। আমিও তখন পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাংলা ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটার সময় চুকনগরে এসে পৌঁছি। নৌকা পাড়ে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা থেকে গুলি শুরু হয়ে গেলো। লোকজন সব ছুটাছুটি করতে লাগলো। আমরা প্রায় পাঁচ-ছয় জন লোক খেজুর বাগানে একটি নৌকার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলাম। দেখলাম প্রচুর লোক গুলির আঘাতে নদীতে পড়ছে। নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছিলো। আমাদের পাশের নৌকাতে কিছু লোক লুকিয়ে ছিল। তারা কিছুক্ষণ পর পর উঁকি মেরে দেখছিলো বিধায় একটা পর্যায়ে খান সেনারা তাদেরকে দেখে ফেলে এবং যথারীতি লাইন করে তাদেরকে গুলি করে। আমরা ভাবছিলাম এই বুঝি আমাদের এখানে আসে। কিন্তু তারা এদিকে না এসে পরবর্তীতে গুলি করতে করতে বাজারের দিকে চলে যায়। তখন নদীতে ভাটা পড়ে যাওয়ায় আমরা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে রওয়ানা হই।

সেদিন চুকনগরে বটিয়াঘাটা, দা-কুপা, পাইকগাছা, ডুমুরিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকেরা এসে ভারতে যাবে বলে জড়ো হয়েছিলো। মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এরা গুলির ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করায় ক্রস ফায়ারে পড়ে অনেকে মারা যায়। সেখানে আমার জ্যাঠাইমা, খুড়তুতু ভাই মারা যায়। "আমাদের গ্রামের এক লোক মন্মথ নাম, তিনি গুলির আওয়াজ শুনে হাত উঠাইয়া সারেন্ডার করে। সারেন্ডার করার সাথে সাথে তাকে গুলি করে। সেই লোক সেখানে মারা গেল।" আহত যারা ছিল তাদের মধ্যে আমার জানা মতে দু'জন এখনও বেঁচে আছে। তাদের পিঠে গুলির দাগ আছে। তারা হলো পরিমল এবং অভিমন্যু।

এই ঘটনায় আমার পরিবার, ছেলে-মেয়ে নিয়ে কষ্ট করতে হয়েছে—এক মুসলমান বাড়িতে গেলে তারা বললো আমরা তোমাদের রাখতে পারবো না, চাল-ডাল দেই তোমরা অন্য জায়গায় গিয়ে থাক। আমার আত্মীয়-স্বজনও অনেকে মারা যায়। এজন্য যারা দায়ী তাদের সুষ্ঠু বিচার হউক এটা আমি অবশ্যই চাই।



কমলা রায়
পিতা : রাজকৃষ্ণ সরদার
বয়স : ৭৫
গ্রাম : শিবনগর
থানা : ডুমুরিয়া
জেলা : খুলনা।

রাজাকারদের লুটপাট আর নানা রকম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার তিন ছেলেসহ গ্রামের অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে নৌকায় করে চুকনগরে আসি। উদ্দেশ্য ভারতে যাওয়া। বাড়িতে নাস্তা করে আসতে পারিনি, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম চুকনগরে খাব বলে। পাঁচই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবারের ঘটনা।

চুকনগরে নৌকা আসার পর নাস্তা খাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময়ে দেখলাম একটি গাড়িতে করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এলো। এসেই গুলি করতে শুরু করলো। আমাদের আর নাস্তা খাওয়া হলো না। জীবন বাঁচানো দায়। নৌকা থেকে আমার এক ছেলেকে সৈন্যরা তুলে নিয়ে গেলো। আর দুটো ছেলে কোথায় গেল বলতে পারবো না। "আমি কান্নাকাটি করে পাগলের মতো হয়ে গেছিলাম। উলঙ্গের মতো। একটা সায়া পরানে ছিল। আর ব্লাউজটা পড়া ছিল। আর কাপড় কোথায় ভাসছে জানি না। তার পরে ঐ ছেলেটার জইন্য, যখন মাঠের উপরে দেখলাম ওরে। ঐ রাইফেলের মাথায় ঐ ছোরার মত কি থাকে না তাই দিয়ে ওরে হত্যা করেছে। ওরে বাবা সেই দৃশ্য দেখা যায় না।" দেড় ভড়ি সোনার জিনিসসহ টাকা-পয়সা যা ছিলো সব ওদের সামনে ফেলে দিয়ে বললাম, "তোমরা আমার ধর্মের বাবা।" আমার ছেলেটাকে আর মেরো না। কপালে, পেটে, পিঠে বেয়নেটের আঘাত। রক্তাক্ত। মৃতপ্রায় ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। বুকে জড়িয়ে ছেলেটিকে নদীর ধারে নিয়ে গেলাম, জল পানের জন্য। নদীর জল রক্তে লাল হয়ে গেছে। একটি নৌকা যাচ্ছিলো, কোথায় যাচ্ছে জানি না, ঝাঁপ দিয়ে উঠলাম। বাড়ি ফিরে এলাম। আহত ছেলেটিকে বাঁচাতে পারলাম না। ঔষধ নেই। ডাক্তার নেই। ভিক্ষে করে কোন রকমে জীবন ধারণ করেছি।

চুকনগরে সেদিন বহু লোককে হত্যা করা হয়। পুরুষদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করেছে। মহিলাদেরও অত্যাচার করেছে। অনেককে তুলে নিয়ে গেছে পাকিস্তানিরা।



সরলা মণ্ডল
স্বামী : অধর মণ্ডল
বয়স : আনুমানিক ৭৫
পেশা : গৃহিণী।
গ্রাম : ছয়ঘরিয়া
থানা : বটিয়াঘাটা
জেলা : খুলনা

সরলা মণ্ডল ১৯৭১ সালে চুকনগর গণহত্যার অন্যতম শিকার। এই হত্যাকাণ্ডে স্বামী একমাত্র ছেলে, আপন দুই ভাই হারিয়ে আজ পাগলপ্রায়। চুকনগর হত্যাকাণ্ডের তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। ১৯৭১ সালে স্বামী একমাত্র পুত্র ও তিন কন্যা নিয়ে তার সুখের সংসার ছিল। ২৫শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই তাদের এলাকায় পাকহানাদার এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের অত্যাচার শুরু হয়, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অনেকটা বাধ্য হয়েই গ্রামের আর সকলের সাথে সরলা মণ্ডলও পরিবার-পরিজন নিয়ে ভারতে যাবার আশায় চুকনগরে এসেছিলেন।

সরলার ভাষ্যমতে হত্যাকাণ্ডের পূর্বদিন বিকেলে (অর্থাৎ বুধবার বিকেলে) তারা সবাই নৌকাযোগে চুকনগর বাজারে এসে পৌঁছান। ঘটনার দিন কোথা থেকে কিভাবে পাকহানাদাররা এসে আক্রমণ শুরু করে তা তিনি বলতে পারেন না। তবে দুজন পাকহানাদার তাদের পরিবারের সদস্যদের গুলি করে হত্যা করেছে, এই স্মৃতি তিনি আজও ভুলতে পারেননি। সরলার ভাষায় "দুজন মানুষ আইসে মাইরে গেল। পর পর আমার স্বামী গেল, আমার ছেলেটা গেল, আমার ভাইপো গুলান গেল। তখন আমার কি অবস্থা আমি ওদের বললাম তোরা আমাদের নিয়ে যা। তাদের তো মাইরে থুইয়ে গেলে। এখন আমরা কি করবো। আমরা বুক পাতিছি। আমাকে একটা গুলি করে যাও। আমরাও তাদের সাথে যাই।" সরলা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের হত্যার পর নদীর পারে এবং নৌকার মধ্যে যারা ছিল তাদের প্রায় সবাইকে হত্যা করে ওরা চলে যায়। স্বামী সন্তানের লাশ নিয়ে সরলা বিলাপ করতে থাকলেন। তারপর এক সময় স্বামী সন্তানের লাশ ফেলে রেখে, বেঁচে যাওয়া অন্য সকলের সাথে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লেন। স্বামী সন্তানের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা এনে দিলেও স্বাধীনতার ত্রিশ বছরে কেউ কোনদিন সরলার কাছে তার বেদনার কথা জানতে চায় নি। সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠানও তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেনি।

সে দুঃখের স্মৃতি নিয়ে আজও সরলা অপেক্ষায় আছেন—যদি কোনদিন তার স্বামী পুত্র ও ভাইপোদের হত্যার বিচার হয় এই আশায়। সরলার ভাষায় "এই যে চইলা আইলাম, আমি যে ছাইড়া আইলাম কত কি জন্মের মতো, এই কথা কি কখনও ভুলা যায়। এই কি দেখা যায়। অতো রক্ত নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।"



আনসার আলী সরদার
পিতা : আকের আলী সরদার
বয়স : ৭৫
পেশা : কৃষিজীবী
গ্রাম : চুকনগর
জেলা : খুলনা।

১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল ৪৫ বছর। তখন আমি কৃষিজীবী ছিলাম। আমার বাড়ি চুকনগরে। হত্যাকাণ্ডের সময় আমি চুকনগরেই ছিলাম। সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের ৫ তারিখ, বৃহস্পতিবার। এলাকার অবস্থা ভালই ছিল। চুকনগর হয়ে ইন্ডিয়া যাওয়া নিরাপদ ছিল বলে খুলনা শহর এবং বটিয়াঘাটা অঞ্চলের প্রচুর লোক চুকনগরে এসেছিল আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

৫ জ্যৈষ্ঠ সকাল আনুমানিক ৮-১০টার সময় সাতক্ষীরার দিক থেকে একটি ট্রাক ও একটি জীপে করে পাকবাহিনীর সদস্যরা বাজারে এসে নামে। নেমে সেখান থেকে পাতখোলার ভিতর দিয়ে ফায়ারিং করতে করতে আমাদের বাড়ির ধারে চলে এলো। আমরা তখন ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম। সন্ধ্যার দিকে সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর আমরা ফিরে এলাম।

"সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মেলা লোক মরা দেখে আমরা আর ঘর থেকে বাইর হইলাম না। পরের দিন ওহাব মাস্টার, মেম্বার আমাদের ডাইকা নিয়া আসলো এবং বললো যে, "তোমার বাড়ির কাছে গন্ধ হয়ে মরে যাবে, তোমরা তো মরবানে। তা তোমাগো কিছু জল খাবার দিবানে। আমার এইটা একটু ফেলাও। যদি বাঁচতে চাও।" আমরা ৪২ জন ২১টি বাঁশ করে লাশ ঠেলে নদীতে ফেললাম। প্রতিবার আমরা ২০০টি লাশ ফেলেছি। ভোর থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত লাশ ফেলেছি। প্রথম কিছুক্ষণ ২০০ করে লাশ গুণেছি। পরে আর গুণতে পারিনি। "বিকেল ৪টা পর্যন্ত লাশ ফেললাম তারপর আর শক্তিতে কুলাইলো না। আর এই দেখলে কি শক্তিতে কুলোয়? আপনি কন দি। ঐ তো অজ্ঞান অবস্থায় ফেলাইছিলাম আমরা।" নিহতদের অধিকাংশ ছিল চুকনগরের বাহিরের। চুকনগরেরও ২/৪ জন মারা গেছে। যাদের লাশ ফেলেছি তাদের অধিকাংশ আধা বয়সের। ৯০ বছরের বুড়ো মানুষও ছিল। তবে মেয়ে ছেলে বা শিশুদের লাশ ছিল না। আমরা ২১টি বাঁশে লাশ ফেলছিলাম। তার মধ্যে "একটা লোক পাইছিলাম জ্যান্ত। তার হাতে গুলি লাগিছে। তার বাড়ি এই বটিয়াঘাটার লাইনে। আমরা টানা তিন মাস তারে একটা হিন্দু বাড়িতে রাইখে সুস্থ করে বাড়ি পাঠাইছি। সে লোক এখনও বাঁইচে আছে। হত্যাকাণ্ডের তিন মাস পর আমাদের এলাকায় রাজাকার বাহিনী আইসলো", কিন্তু স্বাধীনতার পর নিহতদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ বা সাহায্য নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি।



সুরেন্দ্রনাথ বৈরাগী
পিতা : মৃত ঈশ্বর বরদাকান্ত বৈরাগী
বয়স : ৬৭
পেশা : দিনমজুর
গ্রাম : আউশখালি
ডাকঘর : কাঞ্চন নগর
থানা : বটিয়াঘাটা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ৫ তারিখ, বৃহস্পতিবার। চুকনগরে আমার ভাইকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গুলি করে হত্যা করে। সেদিনই সকাল ৮টা/৯টার দিকে আমরা চুকনগরে এলাম। সঙ্গে ছিল মা এবং স্ত্রী। চুকনগরে আসার আগে গ্রামের অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হতে থাকে। নিত্যদিন হত্যা, লুটপাট, চুরি, ডাকাতির ঘটনা ঘটতে থাকে। "গণ্ডগোল, লুটপাট, মারামারি হচ্ছে। আজ গরু নিয়ে যাচ্ছে, কালকে ঐ মানে ধান-চাল, পয়সা-কড়ি, টাকা-পয়সা, এই যার যার কাছে যা আছে। এই দেইখা মানে আমাগেরে আউশখালির সব মানুষ চলে যেতে লাগলো। গরু-বাছুর, ধান, টাকা সব ফেলাইয়া থুইয়া নৌকা ডিঙ্গি সব ফেলাইয়া থুইয়ে আমরা চার গ্রামের মানুষ সব চলে যাচ্ছিলাম।"

এরকম অবস্থায় ভারতে চলে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা চুকনগরে আসি। চুকনগরে পৌছানোর পর যে যার মতো করে খাবারের আয়োজন করছিলো। আমরাও চুলায় ভাত বসিয়ে দিলাম। ভাত একটু হয়ে এসেছে। এমন সময় গুলির শব্দ, ভাত আর খাওয়া হলো না। যে যেদিকে পারে জীবন বাঁচাতে ছুটতে লাগলো। গোলাগুলি থেমে গেলে আমার স্ত্রী এসে জানালো যে ছোট ভাই (শিবপদ বৈরাগী)কে হত্যা করেছে পাকবাহিনী। আমি অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। তবে সেদিন অগণিত মানুষ হত্যা করেছিলো পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী।

আমার জানা মতে, শহীদ পরিবার কোন সাহায্য পায়নি। সরকারি-বেসরকারি কারো কাছ থেকেই না। আমি এই গণহত্যার বিচার দাবি করছি।



বলাই কৃষ্ণ কুণ্ডু
পিতা : ঈশ্বর ফণীভূষণ কুণ্ডু
বয়স : ৬৭
পেশা : দোকানদারী
গ্রাম : মাইলতিয়া
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে আমি চুকনগর বাজারে ব্যবসা করতাম।

সেই সময় চুকনগরে পাকিস্তানি সৈন্যরা যে হত্যাকাণ্ড চালায় তার সঠিক তারিখ মনে নেই। তবে ঘটনাগুলো মনে আছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে 'ঝাঁকে' 'ঝাঁকে' মানুষ ইন্ডিয়া যাবার জন্যে চুকনগরে জমা হয়েছিলো। অধিকাংশ লোক এসেছিলো ভদ্রা নদী পথে, নৌকা করে। চুকনগর থেকে ৭ কি.মি. পথ লোকে লোকারণ্য ছিল। চুকনগরের বাজার, মাঠ এবং আশেপাশের প্রায় বিশ হাজার লোক জমা হয়েছিলো। আর্মি আসার খবর পেয়ে আমি বাজার থেকে চলে যাই। যেহেতু আমরা 'হিন্দু মানুষ', বাড়ির মেয়েছেলে নিয়ে মুসলমান পাড়ায় চলে যাই। বাড়ির লোকদের সেখানে রেখে আবার বাজারের দিকে আসি। দুটি গাড়িতে করে পাকিস্তানি আর্মিরা আসার পর "ভট ভট গুলি হইল, কর কর কইরতে লাগল। ধুমধাম, একেক সময় একেক শব্দ। ঐ সময় আমি গাছের আবডালে দাঁড়াই দেখছিলাম দূরেত থিকে। পেরায় আধা মাইল দূরেত থিকা দেখা যাচ্ছে গুলি করতেছে, গুলি খাচ্ছে।" গুলি করার সময় পাকিস্তানি সেনারা মেশিনগানের মত অস্ত্র ব্যবহার করে। গুলিতে দুই থেকে আড়াই হাজার লোক মারা যায়। পরে শুনলাম যে আমার জ্যাঠাতো ভাই উৎপল সুরেন্দ্র কুণ্ডু মারা গেছে। তিন ঘণ্টা গুলির পর বাজারে এলাম। বাজারে এসে ভেতরে দেখলাম "কয়েকটা শিশু ক্যা ক্যা কইরতেছে। গুলি খাইয়ে কয়েকজন মহিলাও কাটি পড়ে আছে। কেউ বমি করছে, কিন কিনর খুলি বাইরে চলি গেছে, কেহ বসি কাঁদতেছে। এই রকম দেখলাম বিশ-পঞ্চাশ জন। নদীর পারে অনেক লাশ পড়েছিল। যারা বেঁচে ছিল তারা গুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পালায়ে বহুদূর চলি গেছে। কেউ নদী পার হয়ে গেছে, কেউ ঝাঁপাইয়ে নদীতে পড়ছে। নদীতে হয়তো একশ পড়েছে, দশটা সাঁতার দিতে না পেরে নদীতে পড়ে মরেছে। আর কিছু 'কাটিকুটি' গেল। আর 'ডাঙ্গা' পথে ছুটছে চারিদিকে।" হাজার হাজার লোক পালায়। যত লোক পালায় গেছে তার সিকি লোক মারা গেছে। লাশ তিন দিন পর্যন্ত পড়েছিল। পরে ঐ স্থানীয় লোক পয়সা দিয়ে নদীত ফেলে দেয়। ঐ জোয়ারে ভেসে আসতো দশটা লাশ, ভাটিতে পাঁচটা নেমে যেতো। আমার যতদূর মনে আছে তাতে মনে হয় পাকিস্তানি আর্মিরা তিন-চার ঘণ্টা পর্যন্ত এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়। পরে আমরা জানতে পারি যে শামসুদ্দিন খাঁ নামে একজন বিহারি, পাকিস্তানি লোক যে নাকি খেয়াঘাটের পয়সা তুলতো সে ঐ আর্মিদের সহযোগিতা করেছিল। পরস্পর শোনা গেছে চুকনগর হত্যাকাণ্ডের পর। রাজাকাররা কিছু অত্যাচার করেছে। গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি চাই কারণ তারা অন্যায় অত্যাচার করেছে।



মনোরঞ্জন রায়
পিতা : ঈশর রামচরণ রায়
বয়স : ৬৫
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : পূর্ব পাতিবুনিয়া
ইউনিয়ন : ১৪ নং মাগুরখালি
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে চুকনগরে যে গণহত্যা হয়েছিল তখন আমি এখানেই ছিলাম। দিন-তারিখ মনে নেই। পূর্বদিকের লোকজন এদিকে আসতে থাকে ভারতে যাওয়ার জন্য। আমরাও তাদের সঙ্গে আসি, সঙ্গে আমার পরিবারের লোকজন ছিল। এখানে এসেই এই বিপদে পড়ি। ৪টার দিকে মিলিটারিরা এসেছিলো। তারা প্রথমে এলোপাথারি গুলি করে। গুলির শব্দে হৈ চৈ বেঁধে যায়। তখন মিলিটারিরা অনেককে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। আমি একদিকের ৩টি লাইন দেখি। প্রতি লাইনে ২৫/৩০ জন হবে। একটা লাইনকে গুলি করতে দেখেই পাশের বিলে গিয়ে পড়লাম। তারপর আর দেখতে পেলাম না। আমরা নৌকায় করে ঋষি বাড়ির উত্তর পাশে এসে নামি। যখন বেডিং-পত্রসহ ডাঙ্গায় উঠব, তখন একটি ছেলে দৌড়ে আসে বয়স ১৬/১৮ হবে। আমাদের বলে এখানে গুলি হবে, তোমরা চলে যাও। একথা বলেই সে দৌড়ে চলে গেলো। তারপরই মিলিটারি এসে গুলি করতে লাগলো। আমরা ঋষি বাড়ির দক্ষিণ পাশের বিলে গিয়ে পড়লাম। আমার স্ত্রী ও বড় ছেলে আমার সঙ্গে ছিল। মেজো ছেলে ও বড় মেয়ে তাদের মামার সঙ্গে ছিল। মিলিটাররা ঋষি বাড়ির এদিক এসে শুয়ে শুয়ে গুলি করতে থাকে। তখনই আমার স্ত্রীর গায়ে গুলি লাগে। বড় ছেলে বলল বাবা, মা নেই। আমি ছেলেকে চলে যেতে (পালাতে) বললাম। পিছন ফিরে দেখি মিলিটারি আসছে। স্ত্রীকে ঋষি বাড়ির রাস্তার পাশে রেখে আমার ছেলেমেয়েকে খুঁজতে গেলাম। মেজো ছেলেকে পেলাম। বড় মেয়েকে পেলাম না। আমার বাবা নৌকার তলায় লুকিয়ে ছিল। মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম বাবা বলতে পারেন নি। রাস্তার পাশ থেকে আমার স্ত্রীকে নিতে এসে দেখি সব মানুষ মরে গেছে। একনজরে দেখে নৌকায় চলে এলাম। বাড়ি এসে অপারেশন করে স্ত্রীর গুলি বের করাই। এতে আমার এক/দেড় হাজার টাকা খরচ হয়। রাইফেলের গুলি ছিল। বহু জায়গার লোক এসে এখানে (চুকনগরে) জমা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। নিহতদের ভেতর পুরুষের সংখ্যাই বেশি।

হত্যাকাণ্ডের পর আমরা এখানে থেকে যাই। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তারপরও যাইনি। অন্য আহতরাও থেকে গিয়েছিলো। যার যার বাড়িতে চিকিৎসা করিয়েছে।

নিহতদের কিছু পরিবারকে মজিবর সরকার সাহায্য দিয়েছিলো। অন্য কেউ সাহায্য দেয় নাই। আমি এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।



অনিল কৃষ্ণ রায়
পিতা : মৃত অমূল্য চন্দ্র রায়
পেশা : কৃষিকাজ
বয়স : ৬৫
গ্রাম : ঘড়িবুনিয়া
ডাকঘর : পান্থনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

মনে হয় ৫ই জ্যৈষ্ঠ, সেদিন আমি বাজারেই ছিলাম। সে সময় ঐ জমিজমারই কাজ করতাম। ভারতে যাবে বলে বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ সব নৌকা বেয়ে এখানে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করছিলো। কেউ রান্না-বান্না করছিলো, কেউ বসে ছিল। এমন সময় সৈন্যরা এসে কোন কথা না বলে খালি গুলি চালায়। ওরা এলো যশোর থেকে। যশোর থেকে বাস এসে চুকনগর মোড় থেকে ব্যাক করে আঠারো মাইল গেলো। আঠারো মাইল থেকে আবার চুকনগর এসে গুলিগোলা আরম্ভ করে। গুলিগোলা আরম্ভ করলে এমনভাবে মানুষ ছোটাছুটি করতে লাগলো যে তাই দেখে আমি নদীর ঐ পার গেলাম। গিয়ে দেখলাম "গাছের আগায়, বাঁশের আগায় যেসব মানুষ বাঁচার জন্য ঢুকতেছে, পাখি মারার মত তাদের গুলি করছে। রক্তের প্লাবন হয়ে যাচ্ছে। গুলি করে তারা বিভিন্ন জায়গায়, বাঁশের আগায়, এটাও পাখি গোণার মত সার সার গুলি করে ফেলায়। সেগুলো স্যার দেখা যায় না, রক্তে প্লাবিত। মানুষ মরে 'পইড়ে' আছে। ও দৃশ্য মনে হলে চোখ দিয়ে জল আসে। একটা লোক 'জ্যাতা' ছিল, নিয়া গেছিলাম না, তা কইলো আমারে নিয়ে যা। তা নেলাম না। কেডা কারে নেয় তখন। ওরা চলে যাবার পর লাশগুলো সব পড়েছিলো। আমি দেখলাম ২-৩ হাজার লোক গুলি খেয়ে মরেছে। এর বিচার হাজার হাজার বার চাই। প্রয়োজনে সাক্ষী দিতে প্রস্তুত আছি।"

আফসার আলী সরকার
পিতা : সাবেদ আলী সরকার
বয়স : ৬৫
পেশা : কৃষিজীবী
গ্রাম : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

চুকনগরের গণহত্যার আগে থেকেই খান সেনারা এবং রাজাকাররা চুকনগরে আসা যাওয়া করতো। তারা মাঝে মাঝে লুটপাট করতো। আমি তখন চালের ব্যবসা করতাম। আমাদের বাড়ি

একদম বাজারের কাছে। সেদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিন ১০-১১টা এরকম সময় সাতক্ষীরা থেকে গাড়ি এলো। "সাতক্ষীরার দিক থেইকে আইসা একখান এই রাস্তা দিয়ে চইলে গেলো। আর একখান কুঠিপাড়ায় যেয়ে থামলো।" গাড়ি থেকে নেমেই ওরা গুলি করতে করতে ঐ পাড়ার ভিতরে উঠলো। আমরা তো ভীত হয়ে গেলাম। তখন আমাদের চেষ্টা যে কি করে জান বাঁচবে। আমাদের পাড়া, এ পাড়া, গাঙ্গকুল দিয়ে বাজার দিয়ে খুব লোকে মারলো, ওরা গুলি করতেই থাকলো। আমি ভয়েতে গাঙ্গ পার হয়ে ঐ পাড় যেয়ে পালালাম। একটা বড় আমগাছ ছিলো, সে আম গাছের গোড়ায়ে লুকিয়ে দেখতে লাগলাম যে ঐ পার দিয়ে আমাদের বাড়ির ভিতর দিয়ে মারতে লাগলো। গাঙ্গের কুল দিয়ে মারতে লাগলো। গুলি কারো পেটে, কারো গায়ে পড়তে লাগলো। আমি আম গাছের গোড়ায় দেখতে লাগলাম কিভাবে গুলি করছে। গাঙ্গের এপার থেকে ওপার দেখা যায়। খুব বেশি দূর না। সন্ধ্যা পর্যন্ত আম গাছের গোড়ায় বসে থেকে সন্ধ্যায় নদী পার হয়ে পাড়ার ভিতরে ঢুকলাম। "ঐ পাড়ার বাগানের ভিতরে যাইয়া দেখি প্রচুর লোক মাইরে মাইরে থুয়েছে। এক এক জায়গায় ৪, ৫, ৬, ৮টা, কারো মাথা ভাঙছে। কারো বুকে মাইরেছে। কারো পিঠে মাইরেছে। এই অবস্থা দেখি আমি ভীত হয়ে গেলাম। ঘোর সন্ধ্যায় বাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখি আমার মা, পরিবার ও আমাদের ছেলে রয়েছে। মাকে বললাম দুটো ভাত দাও। আমি পরিবার পরিজন ও সন্তান নিয়ে বাঁচতে পারবো কিনা চিন্তা করতে থাকলাম। চিন্তায় চিন্তায় রাতটা কাটলো। সকালবেলা একখান মিলিটারি গাড়ি আসলো। আমাদের বললো লাশ ফেলানোর জন্য। এক হিন্দু বাড়ি থেকে (চিত্তনন্দী) বাঁশ নিলাম, বাঁশ নিয়ে বেশ খাটো খাটো করে এ পাশ বেঁধে দুইজনে মিলে সকাল ৯/১০টার দিকে নদীতে লাশ ফেলতে শুরু করলাম। আমার সাথে ছিল আমার বিয়াই ইনসার আলী।"

সকাল থেকে রাত খানিকটা পর্যন্ত লাশ ফেললাম। প্রথমে গুনেছি তারপর গুনিনি। অগুনতি লাশ ফেললাম! রাতে বাড়ি এসে গোছল করে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনে আমরা সবাই মিলে কম করে হলেও ৫/৬ হাজার লাশ ফেললাম।



এয়াকুব আলী সরদার
পিতা : নবাব আলী সরদার
বয়স : ৬০/৬৫
পেশা : গাছ কাটা
চুকনগর।

আমি সেদিন বাড়িতেই ছিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের ৫ তারিখ, বৃহস্পতিবার দিন। "বেলা সাত-সাড়ে সাতটার সময় গুলি করতে করতে ওরা (আর্মি)

আসছিল। আমি বাড়িতে বসে শুনতে পাই 'পট্ পট্ পট্ পট্' করছে। ভয়েতে বার হইনি আমি।" আর্মিরা দুটো কি তিনটে গাড়ি করে রাস্তা থেকে গুলি করতে করতে বাজারের ভিতর যে কালিবাড়ি আছে সেখানে গাড়ি রেখে নদীর ধারে যায়। কালিবাড়িতে এবং বটগাছের শিকড়ের মদ্যে যারা পালিয়েছিলো তারা মারা পড়ে। স্থানীয় লোক আর বাইরের সব লোক মারা যায়। তবে বেশি মারা যায় বটিয়ার, দক্ষিণ আবাদের কালিগঞ্জের, সেই সমস্ত জায়গার সব লোক। সেদিন ৫ হাজার কি সাড়ে পাঁচ হাজার লোক মারা যায়।

যারা আহত হয়েছিলো তাদের ওষুধ খাইয়ে, ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়ে বাঁচানো হয়। লাশগুলোকে পায়ে মাথায় দড়ি 'বাইন্ধে' বা এক বাঁশের 'তায়ড়া'তে পাঁচ-ছয়টা লাশ একসাথে করে বেঁধে দুইজন মিলে অন্তত দুইশ বিশটা এই রকম লাশ নদীতে ফেলেছি। লাশগুলোতে 'গুলি' চারিদিকেই লেগেছিলো। এককেটা লাশের এমন অবস্থা যে নাড়িভুড়ি বের হয়ে গিয়েছিলো। চোখ গেঁথে বা মাথা ফেটে মাথার ঘিলু বের হয়ে গিয়েছিল।

যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছিলো তাদের বিচার চাই 'এই কারণে যে এই লোকগুলি যে মারা পইরলো, কোন্ কারণে মারা পইরলো?' কিন্তু তার বিচার হবে কি? যদি বিচার হয় তার জন্যই আজকে এখানে 'আইছি'।



জগন্নাথ বালা
পিতা : ভজন বালা
বয়স : ৬৫
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : পূর্বপাতিবুনিয়া
ইউনিয়ন : শিবনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

৫ই জ্যৈষ্ঠ চুকনগর গণহত্যার আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। সে সময় আমি এখনকার মতই কৃষিকাজই করতাম। দেশীয় কিছু লোকজন ও রাজাকার মিলে অত্যাচার, লুটপাট করছিল তাই আমরা ভারতে যাব বলে এখানে আসি। সকাল ১১টা/১২টার দিকে ওরা (আর্মিরা) আসে। ওরা রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে মাঠে নামে। মাঠে যেসব লোকজন ছিল তাদের গুলি করে। লোকজনদের নৌকা থেকে নামিয়ে ডেকে নিয়ে ৫টা লাইন দেয়ায়। আমি দেখলাম আমাকেও ডাকছে হাত দিয়ে। লাইন দিতে দেখে আমি পিছিয়ে আসলাম। লাইনে গেলাম না। কিছুক্ষণ পরে ৫টা লাইনে ৫ জনে গুলি করলো। ঐ লাইনের সবগুলো লোক মারা গেলো। আমি জলের ভেতর একটা নৌকা ভেসে যাচিছলো সে নৌকার আড়ালে থেকে দেখছিলাম কোনদিকে গুলি করে। গুলিগোলা শেষ হলে আমি

সেখান থেকে চলে গেলাম।

হাজার চারেকের উপরে লোক গুলিতে মারা যায়। তাদের বেয়নেট দিয়েও 'কোপাইয়ে কোপাইয়ে' মেরেছে। ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা এই দিকের লোকই বেশি মারা যায়। আমার এক ভাই গুলি খায় এবং তাকে বেয়নেট দিয়ে কোপ দিলে তার নাড়িভুড়ি বার হয়ে যেয়ে জলে ভাসছিল। তখন ঐ নাড়িটা বাম হাত দিয়ে 'চাইপে' রেখে আমাকে বলছে কি—"ওরে ভাই আমার এই নাড়িটা ভিতরে ঢুকাইয়া দেও।" সে যে কি দৃশ্য! কিছু সময় ধরে সে ঐ জলের ভিতর ঘুরে ঘুরে মারা যায়। মারা গেলে আমি ওখান থেকে চলে গেলাম।



মোহাম্মদ শের আলী সরদার
পিতা : আহাদ আলী সরকার
বয়স : ৬৩
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : চুকনগর।

যেদিন গুলি হয় তার আগে রাতের বেলা 'ঘুম পারা যেতো না', জেগে থাকতে হতো। 'আমরা রাত্রিরে বিছানায় পা-ই দিতে পারি নাই। ঐ আসছে এইখানে সব দৌড়া, কাল ঐখানে দৌড়া। কানে ধুরুম ধারাম শব্দ আসতো।' আতঙ্ক, ভয়েতে রাত কাটাতে হতো। আতঙ্ক আতঙ্কভাবে দিন কাটিয়েছি।

ওরা (আর্মি) এলো জ্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচ তারিখ, সেই বৃহস্পতিবারে বেলা ১০টা কি সাড়ে ১০টার সময় যে গুলি শুরু হয় তা বেলা তিনটা পর্যন্ত চলে। আমি বাড়ির থেকে খবর পাই, শুনি যে এই জায়গায় (চুকনগর বাজার) গুলি চলছে। 'শব্দ তো ডিক্লেয়ার হয়ে গেল যে ঐখানে চারটা-পাঁচটা মরছে। পাথরখোলায় মানুষ মেরে লাশ ফেলাই রাখছে।' এই খবর শুনে আমরা তো বাড়ি ছেড়ে ঘরে তালাচাবি দিয়ে একখানা গর্ত ছিল সেই গর্তের ভিতর যেয়ে বসে থাকি।

ওরা আসলো এই পশ্চিম, সাতক্ষীরার দিক থেকে। গাড়ি আসলো, গাড়ি এসে এই গ্রামটার ঐ মাথার থেকে ওরা ঐ ধার দিয়ে নেমে গেল। বাজারের রোড দিয়ে একখানা গাড়ি বাজারের ভিতরে ঢুকে গেল। ওরা তিন গাড়ি আসে। তিন গাড়ি তিনভাবে ভিতরে গেল। নদীর সাইডে ঢুকেছিলো। আর এই বাজারে এই রাস্তার ফাঁক দিয়ে ঘোরাফেরা করতো। আর দুপুরবেলা এই সাইডে পাঁচখানা গাড়ি আসে। পাঁচখানা আমরা দেখি নাই, আমরা তিনখানাই দেখেছি।

গাড়ি দেখলাম আমার বাড়ির সামনে যেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমার চাচাকে দেখা যেত হিন্দুর মত। আপনার মতন এরকম পরিষ্কার। 'আমার চাচারে দেহি তা ওনারা কইতেছে কি তোর নাম কি? কয় আমার নাম রতন আলী, রতন সরদার।

রতন আবার সরদার হয়? কিরুম করি? তুই কি মুসলিম না মালাউন হ্যায়। কয় আমি মুসলিম হ্যায়। কয় নাহ্, তুই মুসলিম হয় না। তুই মালাউন হ্যায়। তো এরপর কাপড় উঁচু করতি কয়। তো বলে কাপড় উঁচু করি দেখাইতে হইবে। আমার চাচা দেখাইলো। তো সেই হরি মানে বিশ্বাস করলো। আমারে আর আমার চাচারে সাথে করে নিয়ে গেল। বলছিল যে আমাদের দেখাই যে কমনে কমনে লোক আছে। কি করবো ওগির সাথে থাক্তি হলো আর ওরা গুলি করতি লাগিল। উপায় তো নেই। জীবনের ভয়েতে, ওদের না দেখাইলে আমাদের গুলি করতে পারতো। এই তিনডো পর্যন্ত মাইরে, তিনডোর পর ওরা আবার টাউনে চলে গেল ডাইনের সাতক্ষীরা রোডে।'

লাশ সরাতে গিয়ে দেখি যে পিঠের দিক দিয়ে গুলি চলে গেছে। বুক কলিজা-মলিজা সব উঠে চলে গেছে। গলার কণ্ঠমালায় সব উঠে চলে গেছে। এইরম অবস্থা দেখলি মনে অসহ্য লাগে।

তা আমরা দুই ভাই দুইশ একখান লাশ সরিয়েছি। এক 'খানি' দুইজন। দুইজন করে লোক ঐ এক পাশে এককেটা দড়ি, পেছনে দড়ি। 'মাজা দিয়ে বাঁশ কুইড়ে দিয়ে দুইজন ঘাড়ে করে নিয়ে নদীতে (ভদ্রা নদী) ফেলে এলাম।' দুইশ করিয়া খানি ফেলিয়ে তারপর আমার চোখ-টোখ মানে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার মতন হয়ে যায়।

'আমরা ঘাড়ে করি লাশ ফেললাম। মাইরলো আমার পুকুর পাড়ে, তা এর বিচারডা আমার চাব না? বিচার না হলি আমরা টিকতে পারবো না। বিচারডা করবে কেডা? আমার নিয়ে তদন্ত করবে কেডা? বিচারডা কবো কার কাছে? আমরা সেই লোকই তো খুঁইজে পাইছি না। বিচার তো আমরা চাই। আমরা যদি বাস্তবিক করতে পারি এই বিচারটা বাপ-চাচারা তো চইলেই গেছে এখন তার (শহীদ পরিবার) মা-চাচীরা, ভাই-বোন, কডা আছে তারা সুস্থ মতন যাতে থাক্তি পারে, খাওয়া পড়া পায়, এই আমার দাবি।'



নগর বিশ্বাস
পিতা : দুলাল বিশ্বাস
বয়স : ৫৫/৬০
পেশা : কৃষিজীবী
গ্রাম : কাঞ্চন নগর
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে আমি তখন ২৫/২৬ বছরের যুবক। কৃষিকাজ করি। হঠাৎ করে যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের এলাকায় গণ্ডগোল দেখা দিল। তখন আমাদের

এলাকার লোকজন দেশে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে ইন্ডিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। চুকনগর হয়ে ইন্ডিয়া যাওয়ার একটি নিরাপদ রোড ছিল।

ইন্ডিয়া যাওয়ার জন্য গ্রামের অন্য সবার সাথে আমরাও একশ টাকায় নৌকা ভাড়া করে বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক আটটা, নয়টার দিকে চুকনগরে এসে পৌছলাম। পৌছে দেখি শুধু নৌকা আর নৌকা। নৌকা দিয়ে নদী পার হওয়া যায়। আমাদের নৌকা চুকনগর বাজারের আধ মাইল পূর্বে ভিড়লো। নৌকা ভিড়লে ভাত রেঁধে আমরা চারজন লোক যখন ভাত খেতে বসেছি, ভাত মুখে দিয়েছি কি দেইনি, তখন মানুষের হৈ চৈ শুরু হলো। তখনই গুলি হতে লাগলো। তখন কিছু লোক বলল, "ফাঁড়ির লোক এসেছে। তোমাদের ভালোর জন্য এসেছে। তোমাদের কোন অসুবিধা নেই। তোমরা পাক সাক করে খাও।" গুলি বাড়তে থাকলো। আমার বউ বাড়ি থেকে আনা লেপের বস্তা দুটা আমার ঘাড়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিল এবং শাড়ি পড়িয়ে দিল। মাইয়া ছেলে ভাইবা গুলি না করেই চলে গেল। ওরা চলে যাওয়ার পর পরই আমার মা আমার বউসহ আমাকে দৌড়ে পালায়ে যেতে বললো। শেষে আমরা দৌড় দিলাম। দৌড়ে বুড়িমারি বিলে পড়লাম। বিলে 'পইড়ে' বনের মধ্যে দিয়ে অন্য গ্রামে উঠলাম। এ গ্রামে উঠে অন্যদের কাছে শুনলাম যে আমার ভাই মারা গেছে। "তখন আমি দুটো-তিনটে লোক সাথে কইরে নিয়ে আইসা দেখি সে মইরে গেছে। আর বাবা গুলি লাগি পড়ে আছে। আমি ভাইর লাশ নিয়ে যেতে চাইলে সবাই বলে "লাশ নিয়ে তুমি এখন কোথায় যাবা। এত বড় লাশ আমরা কোথায় নিয়ে যাব?" তখন সবাই ভাইয়ের লাশ গাঙ্গে ফেলে দিল।

বাবারে সেখান থেকে ধইরে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। সেই ডাক্তার বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে দিল। আমরা গড়াই গড়াই চলি গেলাম ইন্ডিয়ায়। সেখানে যাওয়ার তিন মাস পর আমার বাবা মইরে গেল।'

ঐদিন আমার ভাই, মামা, মামাতো ভাইসহ চারজন নিকটাত্মীয় স্বজনসহ প্রায় ছয় হাজার লোক মারা গেল।

আমার ভাই মারা গেল বিনা অপরাধে, আমার বাবা গুলি খেয়ে মারা গেল, আমরা গরিব মানুষ। এতে খুব দেনা হয়ে গেলাম। আমি আমার ভাই ও বাবার হত্যাকারীদের বিচার চাই।



অশ্বিনীকুমার মণ্ডল
পিতা : মৃত মনোহর মণ্ডল
বয়স : ৬১
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : বয়ারভাঙ্গা
থানা : বটিয়াঘাটা।

মে মাসের শুরুতেই খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে

পাকসেনারা আক্রমণ করছিলো। গোলাগুলির শব্দে লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্যই ফকিরহাট, রামপাল, বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া অঞ্চলের লোকেরা চুকনগরে জড়ো হচ্ছিলো। এ উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ি থেকে (বয়ারভাঙ্গা) আমি এবং আমার পরিবারসহ রওনা করে রাতে খনিয়া বাজারে পৌছি। চুকনগর থেকে এর দূরত্ব ছিল ছয়-সাত কিলোমিটার। পরদিন অর্থাৎ ৫ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার বেলা ৯টায় (আনুমানিক) চুকনগরে আসি। বর্ডার ক্রস করে ওপাড়ে (ভারতে) যাব বলে যানবাহনের খোঁজ করছিলাম। ইতোমধ্যে বাজারের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে গুলি শুরু হয়ে গিয়েছে। তখন এ এলাকায় লোকে লোকারণ্য ছিল। যশোর থেকে এগারোটার সময় পাকসেনারা গাড়ি নিয়ে এখানে আসে। "ওরা আইসেই ওমনি লোক জড়ো দেখে ঐ যে ছোট ছোট ছিদ্রওয়ালা এতটুকু লম্বা একটা অস্ত্র দিয়ে বিশ-ত্রিশ রাউন্ড গুলি করলো। আর লোকগুলো সব ফট্ ফট্ করি পড়ি যাতি লাগলো।" এ দেখে আমি মেয়ে দুটোকে নিয়ে নদী পার হয়ে একটা খালের পাড়ে এসে লুকিয়ে থাকি।

লোকজন সব দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি করছিল। আমার স্ত্রী এবং ছেলে আমার থেকে আলাদা হয়ে যায়।

কিছু খাবার-দাবার এবং জিনিসপত্র নিয়ে বাবা এবং কাকা বসেছিলো দোকানের এক বারান্দায়। আমি পালিয়ে যাবার সময় বাবাকে বললাম চল পাকসেনারা এসছে, গুলি হচ্ছে, অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে। বাবা বললো "আমি বুড়ো মানুষ আমাদের কিছু করবে না নে। আর আমি যদি এখান থেকে সরে যাই তালি এই জিনিসপাতি যা আছে এসব নিয়ে যাবে নে। আমি যাব না।" পরবর্তীতে পাকসেনারা চলে যাবার পর বেলা আনুমানিক চারটা-পাঁচটার সময় আমি যখন এখানে আসি তখন দেখি আমার বাবা এবং কাকা ঠিক যে জায়গায় বসেছিল সেখানেই মরে পড়ে আছে। বাবার লাশে আমি আর হাত দিতে পারি নি। মরে ফুলে আছে। লাশগুলো সব নদীতে ফেলে দেয়া হয়।

আমার স্ত্রী এবং ছেলেকে খুঁজে পেলাম। ওরা গোলাগুলির সময় নদীর পাড়ে নৌকার মধ্যে বসেছিলো। তবে গোলাগুলির মধ্যেও দু-একজন বেঁচেছিল। আমার মামা চুকনগর বাজারের ভেতর দালানের সংলগ্ন একটা সরু রাস্তা দিয়ে তার ভেতরে গিয়ে কষ্ট করে সেই দালানের ওপর উঠে বসেছিলো। এ অবস্থায় সে বেঁচেছিলো।

পরবর্তীতে আমার এবং মামার পরিবারের কেউ ভারতে যেতে পারলাম না। আমরা তখন ওখান থেকে কেশবপুরের ভেতর থেকে ত্রিমোহিনী হয়ে কপোতাক্ষের পাড়ে ঝাউডাঙ্গায় পৌছি। সাতক্ষীরার উত্তরে ঝাউডাঙ্গার অবস্থান। সেখানেও গুলি হচ্ছে দেখে প্রাণভয়ে বাচ্চাদের নিয়ে ওখান থেকে এগিয়ে একটা জায়গায় কিছুদিন আত্মগোপন করি। তারপর সেখান থেকে বাড়িতে নির্ধারিত স্থানে না যেয়ে একটু দূরে কোনরকমে নয়টি মাস আত্মগোপন করেছিলাম। সে সময়টায় নিদারুণ কষ্টে ছিলাম। নারকেলের মালায় করে জল খেতাম। আমাদের সব লুট হয়ে যাওয়ায় কাঁথা বালিশের অভাবে ঘুমাতে খুব সমস্যা হয়। শাক-সব্জি এটা সেটা তুলে এনে

সেদ্ধ করে খেতাম। "দুঃখের কাহিনী সেটা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আধমরা অবস্থায় জীবনটারে কোনরকমে বাঁচাই আর কি।" উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধের মাঝামাঝিতে এখানে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। তাদের মধ্যে ডুমুরিয়া, গেটুদিয়া গ্রামের কিছু রাজাকার ছিল। গেটুদিয়া গ্রামের সাজ্জাদ বিশ্বাস রাজাকার কমান্ডার ছিল। সে তখন জনগণের ওপর খুব নির্যাতন চালিয়েছিলো। বর্তমানে সে ডুমুরিয়া গ্রামে বসবাস করছে। তাছাড়া আবুল মল্লিক ছিল ডুমুরিয়া গ্রামের। শরাপুর গ্রামের কিছু লোক রাজাকার বাহিনীতে ছিল।

আমার এ জীবনের জন্য ওরাই দায়ী। আমার বাবা, কাকা এবং অন্যদের ওরাই মেরেছে। সুতরাং শহীদ পরিবারের ভুক্তভোগী হিসাবে আমি তাদের বিচার চাই এবং আমি মনে করি এর বিচার হওয়া উচিত। আরও বহু শহীদ পরিবারের লোকও এর বিচার চায়।



সরদার মুহাম্মদ নূর আলী
পিতা : সরদার মুহাম্মদ আক্কাস আলী
বয়স : ৬০
পেশা : শিক্ষকতা
গ্রাম : রুস্তমপুর
ডাকঘর : চুকনগর।

যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমি গ্রামেই ছিলাম। তবে খুব সন্তর্পণে এবং প্রায়ই পালিয়ে থাকতে হতো। কারণ আমি ছিলাম আমার বাবার একমাত্র ছেলে এবং আটরিয়া ইউনিয়ন কমিটির আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক। সে সময় আমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করতাম। চুকনগরে গণহত্যার ঘটনাটি ঘটে ২০শে মে, বৃহস্পতিবার ১৯৭১ সালে।

আমাদের এই বটিয়াঘাটা, রামপাল, বাগেরহাট এলাকার লোক বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক তারা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য চুকনগর হয়ে ভারতে যাচ্ছিলো। বাড়ি-ঘর ছেড়ে নৌকা ভর্তি করে চারপাশ থেকে লোকজন এসে স্কুল, বাজার বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছিলো, বিশ্রাম নিয়ে খেয়ে-দেয়ে যাচ্ছিলো। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দিয়ে আমরা তাদের বর্ডার পর্যন্ত পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাদের থাকার ব্যবস্থাও করেছিলাম হাইস্কুল, বাজার পার্শ্ববর্তী এলাকার গ্রামে এবং আমাদের যে সংগঠন ছিল সেখানেও। ঐদিন আমরা বাজারেই ছিলাম চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছি। এমন সময় বাজারের দক্ষিণ দিক মাইলটা গ্রাম থেকে কলেজের দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে আমরা কিছু গুলির আওয়াজ শুনলাম। আমি বেশ একটু ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। তখন সকাল সাড়ে দশটা বা পৌনে এগারোটা বাজে। স্কুলের দিকে লাখ লাখ লোক ছেলে, মেয়ে, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক বহু

লোক তারা ঐ রান্নাবান্না করে খেয়ে চলে যাবে এরকম অবস্থায় ছিল। গুলির শব্দ শুনে তাদের সতর্ক করতে লাগলাম যে বিপদ আসতে পারে তোমরা যেদিকে পারো চলে যাও। অনেক বৃদ্ধ, মেয়েছেলে, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সরে যেতে পারে নি। আর যারা পেরেছে তারা চলে গেলো। যারা পারেনি তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। তিন থেকে চার ঘন্টার মত গুলি করে পাখির মত করে লোক মেরেছে।

খাকি পোশাক অবস্থায় পাকিস্তানি মিলিটারিরা একটা ট্রাক এবং দুটো গাড়িতে করে এসেছে। ওদের দেখে আমরা পালায়ে যাই। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত চোখের সামনে না আসে ততক্ষণ পালাইনি। গোলাগুলি শেষ হলে বেলা আনুমানিক চারটা, পৌনে চারটার দিকে কয়েকজন লোক নিয়ে বাজারে ঢুকলাম। তখন সারাদিন খাওয়া হয়নি। ঐ অবস্থায় রক্ত দেখে মাথা ঘুরে গেলে দশ-পনেরো মিনিট নির্বাক হয়ে বসে থাকলাম। পরে মাথায় পানি-টানি দিয়ে ঠিক হলে বাজারের ভিতর মন্দির কালিবাড়ি গিয়ে সেখানে দেখলাম যে রক্তের উপর পাঁচ-সাত জন মরে পড়ে আছে। একটা লোক দেখলাম বেড়ায় গায়ে হেলান দেয়া, মনে হচ্ছে যেন জীবিত। কিন্তু তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম মারা গেছেন। এই রকম অনেক দৃশ্য দেখে আস্তে আস্তে নির্বাক হয়ে মাথা ঘুরতে লাগলো তখন আমি ঐসব দৃশ্য আর সহ্য করতে না পেরে ফিরে আসলাম। আসার পথে কলেজের মাঠে অনেক লাশ পড়া দেখলাম। লোকজন তখনও দৌড়াদৌড়ি করছে পালাচ্ছে চারিদিকে। যারা হারিয়ে গেছে তাদের খোঁজাখুঁজি করছে। সে এক করুণ নারকীয় দৃশ্য ভোলা যায় না। আমাদের এলাকায় প্রায় চার মাইলব্যাপী এই হত্যাযজ্ঞ চলেছে। আমার অনুমান পাঁচ হাজার লোক বা ততোধিক লোক মারা গেছে। সেখানে দুই লাখের মত শরণার্থী ছিল। লাশগুলো কিছু নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয় এবং দুর্গন্ধ এড়ানোর জন্য কিছু লাশ মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল। এলাকার লোক দুই মাস পর্যন্ত ঐ নদীর মাছ খায় নি। বাজার বন্ধ হয়ে যায়। ভয়ে লোকজন পাঁচ-ছয় মাস পর্যন্ত বাজারেও আসেনি।



আনোয়ার আলী মোড়ল
পিতা : মোহাম্মদ মানিক মোড়ল
বয়স : ৬০
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

আমি চুকনগর গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তারিখটা ছিল ৫ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার। বেলা আনুমানিক ১০টা সাড়ে ১০টা। পাকিস্তানি সৈন্যদের দুটো গাড়ি এসে থামে। আমাদের কাছাকাছি ৬০ উর্ধ্ব এক লোককে তারা গুলি করে মেরে ফেলে। বিল

থেকে ঘাস কেটে আসছে কুণ্ডু মশাই, তাকেও গুলি করে মারে। গুলির শব্দ শুনে গ্রামের একটি বাড়িতে মহিলাসহ কিছু লোক আশ্রয় নেয়। তখন বাড়ির ১০/১১ বছরের একটি বালিকা জানালা খুলে বাইরে তাকালে খান ফৌজিরা তাকে গুলি করে। বাড়ির লোকজন পুকুরপাড়ে নিচু জায়গায় গিয়ে লুকায়। ফৌজিরা আমার কাছে এলে আমার ভাই বুদ্ধি করে বলে "নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর।" আমরা সবাইও 'কান্দো কান্দো' স্বরে "নারায়ে তকবীর আল্লাহ আকবার" বলতে থাকি। পাক সৈন্যরা আমাদের সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে কাপড় উঁচু করে দেখে আমরা মুসলমান কি না। আমাদের মাঝে অনিল কুমার নামে একজন হিন্দুও ছিল। প্রাণের ভয়ে আমরা পরিচয় দিলাম সবাই মুসলমান। দক্ষিণ দিক থেকে লোকজন এসে নৌকাঘাটের ব্রিজ পার হয়ে নদীর পাড়ে সমবেত হচ্ছিলো। সবাই তখন রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। পাক সৈন্যরা 'টক টক করে আইসে' সবার ওপর গুলিবর্ষণ করে। এসব লোক আবাদ অঞ্চল থেকে এসেছে, ভারতে যাওয়ার জন্য। পাক সৈন্যদের ভয়ে অনেকেই নদী সাঁতরিয়ে, গাছের শিকড়ে, কালিপাড়ার বটগাছের শিকড়ের ভেতর পালায়। এখানকার চেয়ে বাজারের বল খেলার মাঠে বেশি লোক ছিল। সেখানে গুলি করলে যে যেভাবে ছিল সেভাবে মারা যায়। হত্যাকাণ্ডের পর এলাকার লোকজন "হাওয়া হয়ে গেল" লাশ বাদে আর কিছুই নাই। মৃত লোকদের বেশির ভাগই অন্য এলাকার, চুকনগরের ৭/৮ জন মারা যায়।

আইন অনুযায়ী এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া উচিত।



রুহিদাস চন্দ্র রায়
পিতা : পূর্ণ চন্দ্র রায়
বয়স : ৬০
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : খড়িবুনিয়া
থানা : ডুমুরিয়া।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাবা-মা, ভাইবোনসহ পুরো পরিবার নিয়ে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে বৃহস্পতি বা শুক্রবারে গ্রামের বাড়ি থেকে সালতা নদী হয়ে নৌকায় করে ভারতে যাবার জন্য চুকনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার দশ হাজারের মত লোক জমা হয় চুকনগরে। সকাল এগারোটা কি বারোটার সময় চুকনগরে পৌছাই।

কিছু একটা মুখে দিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেবার জন্য রান্নার আয়োজন শুরু করেছি মাত্র। এমন সময় শুনতে পেলাম গুলির শব্দ। অবিরাম গুলি হচ্ছে। ভাত আর খাওয়া হলো না। শুকনো চিড়া মুখে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ দৌড়াতে

থাকলাম নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। এলোপাথারি গুলি করতে থাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চারজন সদস্য। "ঐ গুলি করছিল তারই মধ্যে লোক মনে হয় ফুটি ফুটি বার হচ্ছিল ছুটোছুটি করছিল যে যেনে পারে তারই মধ্যে গুলি লেগেছিল।" এই গোলাগুলির মধ্যে আমার সেজ দাদা মারা যান।

বাবার কথামতো ভারতে না গিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই। সেখানে আবার রাজাকারদের অত্যাচারের শিকার হই। রাজাকার কমান্ডার আবুল, মোকসেদ কবিরাজ এরা অত্যাচার, নির্যাতনে নেতৃত্ব দেয়। ভিক্ষে করে বহু কষ্টে জীবন ধারণ করেছি। "আমার এখনো চোখ দি জল পড়ে বুইছেন। ... শাস্তি হলে আমি খুব শান্তি পাই। আমার খুব আনন্দ হয় তাদের শাস্তি হলে। আনন্দ পাই।"



কালিদাসী মণ্ডল
পিতা : গোবর্দ্ধন মণ্ডল
বয়স : ৬০
পেশা : গৃহকাজ
গ্রাম : খনসীবুনিয়া
থানা : বটিয়াঘাটা।

দিনটি ছিল বুধবার, বেলা ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে আমরা চুকনগরে পৌঁছি। উদ্দেশ্য মাঠে বসে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার রওয়ানা করবো (ভারতের উদ্দেশ্যে)। আমার স্বামী তখন চুকনগর বাজারে ছিল। বাজারটা আমাদের এ জায়গা থেকে বেশ দূরেই। সেখানে ধারে কাছে দু-একটা বাড়ি ছিল কিনা মনে নেই। তবে সামনেই নদী ছিল, বাজারটা ছিল তার বামপাশে।

গুলি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামী দৌড়ে আমাদের এখানে চলে এলো। আমরা তখন সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলাম। সেখানেও পাকসেনারা গুলি করতে করতে চলে এলো। আমার শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী, দেবর এবং আমার দুই ছেলেসহ সেখানে আমরা প্রায় ১০/১২ জন লোক ছিলাম। গুলি করলো আমার শ্বশুর, স্বামী এবং দেবরসহ আরো দু-তিনজনকে। আমি তখন আমার স্বামীকে হাতের ওপর উঠিয়ে রাখলে রক্তে আমার শরীর ভরে যায়। তাকে গুলি করার সময় "আমি কলাম কি, আমার স্বামীকে মাইরে যাচ্ছো, আমাগের এহানে মাইরে যাও। তা সে ঐরম আবার কয় কি যে, মহিলা যে সেজন্য গুলি কইরে নি।" তাছাড়া কেউ কেউ প্রাণভয়ে গাছে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদেরকেও গুলি করে পাখির মত নিচে ফেলে দেয়। একপর্যায়ে গুলি করতে করতে তাদের গুলি শেষ হয়ে যায়। "সে সময় তারা কলি কি শালারা তোরা আজকে বাইচে গেলি, গুলি নাই আর।"

পরবর্তীতে আমরা বাড়িতে চলে আসি। সেখানে কিছুদিন থাকার পর ভারতে

চলে যাই। ফিরে এলাম পর "আমি গরিব মানুষ, জমি নেই, কি খাব? খুব কষ্ট কইরে চইলতে হয়। আমার স্বামীরে ওরা মাইরে ফেললো, আমি আজকে পথের ভিখারি।" তাই আমার এ অবস্থার জন্য যারা দায়ী আমি অবশ্যই তাদের বিচার চাই।



শ্রীমতি আনারতি তরফদার
পিতা : হরিপদ
বয়স : ৬০
পেশা : গৃহকাজ
গ্রাম : মাইটভাঙ্গা
থানা : বটিয়াঘাটা।

বৈশাখ মাসের শেষ দিকে গ্রামের অবস্থা ভাল না। যে যার সুবিধা মতো ভারতে চলে যাচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের তিন তারিখে চুকনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম নৌকায় করে। পাঁচ তারিখে চুকনগরে পৌঁছাই। হঠাৎ শুনলাম গুলির শব্দ। পাকিস্তান সেনাবাহিনী গুলি করছে। আমরা কিছুটা দূরে গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। সেখানেও গুলি এসে আঘাত করছিলো। আমাদের পাশেই দুজনের গুলি লাগে, তারা ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে। আমার দু মেয়ের গায়ে গুলি লাগে। একজনের পিঠে, অন্যজনের পায়ে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চলে গেলে, আহত মেয়েদের নিয়ে নদী পার হয়ে এক বাড়িতে রাতের জন্য আশ্রয় নেই। সেখানে প্রায় দেড় মাস ছিলাম। মেয়েদের অবস্থা একটু ভালো হলে হিন্দুস্থানে চলে যাই।

এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী পাকিস্তানিদের বিচার চাই। আমার মেয়েটি আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। তার তো বিয়েও হবে না। "পরের ছাওয়ালও দিতে পারছি না পরেও তো নিচ্ছে না। খোঁড়া হয়ে গেছে। তো এর কোন ব্যবস্থা হবে না?"

এরশাদ আলী মোড়ল
পিতা : চেকন মোড়ল
বয়স : ৬০
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : মালতিয়া
ডাকঘর : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি কৃষিকাজ করতাম। ১৯৭১ সালে ২০মে বৃহস্পতিবারের দিন আমরা তিন ভাই আমাদের বাবার সাথে আমাদের বাড়ি থেকে তিনশ হাত দূরে একটা জমিতে লাঙ্গল চষছিলাম। এমন সময় একটা গাড়ি সাতক্ষীরার দিক থেকে খুব দ্রুত চুকনগর বাজারের দিকে আসলো। আর একটা গাড়ি আমরা যেখানে চাষ করছিলাম সেখানে এসে থামলো। আমাদের চাষের জমির দু'শ হাত দূরে নৌকায় করে প্রচুর লোক চুকনগর বাজার এবং এর আশেপাশে নদীর তীরে নৌকা ভিড়াচ্ছিলো। তাদের কেউ খাচ্ছে, কেউ রান্না করছে, কেউ অন্যান্য কাজ করছে। সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে আমার আব্বা আমার নাম ধরে ডেকে বললো "এরশাদ, ঐ দেখ মিলিটারির গাড়ি আসছে, শীঘ্রই পালা।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিন ভাই দৌড় দিয়ে বাড়ির ভিতর পৌছে গেলাম। বাড়ির ভিতর পৌছে আমরা দেখলাম, মিলিটারিরা বাবার সাথে কি যেন কথা বললো। বাবার হাতে ছিল একটি কাঁচি। তারা বাবাকে গুলি করলো। বাবাকে গুলি করার সাথে আমার মা চিৎকার করে উঠল যে, "তোর আব্বা হয়তো নেই। তোর আব্বারে দেখ গুলি করে দিচ্ছে।" মা আরও বললেন "বাপ তোরা কাঁদিস না। দেখ শেখ মুজিব যে কথা বলেছিল যার যা আছে তাই নিয়ে তোরা ঝাঁপিয়ে পড়। তোদের আব্বা তো কাঁচি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তোরা ঐ পথে যা। দেখ ঐ হাজার হাজার লোক এয়েছে। ওদের যদি তোরা বাঁচাতে পারিস, সেই চেষ্টা কর।" আমার বাবার লাশ ওখানেই রইলো। বাবাকে শুধু একবার দেখলাম। এই বগল থেকে গুলি করছে আর ঐ বগল থেকে বেরিয়ে গেছে। মা বাবার লাশ নিয়ে কাঁদছে। মার আশীর্বাদ নিয়ে একটি লাঠি হাতে ঝাঁপ দিলাম। বিশ হাত তফাতে গিয়ে দেখলাম, পাকহানাদার বাহিনী মেশিনগান দিয়ে গুলি করছে। আর লোকজন মরে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। মানুষের কান্নায় পুরো অঞ্চল ভারি হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাবীরা বন্দুকের মাথায় কি একটা থাকে তাই দিয়ে খোঁচায় খোঁচায় মানুষ মারছিল। সে দৃশ্য দেখা যায় না। শিশু মার দুধ খাচ্ছে। মা মারা গেছে। আমার বাবার লাশ থেকে একশ হাত দূরে গিয়ে দেখি একটা মেয়ে শুধু কাকা বাবা বলে ডাকছে। আমি মেয়েটির কাছে গেলাম। সে বললো "কাকা আমায় জল খাওয়াও।" মেয়েটার বয়স তের থেকে চৌদ্দ, মেয়েটার উরুতে লেগেছে। আমি মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বললাম, মা আমি জল নিয়ে আসছি। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে মারা গেল। মেয়েটার লাশ রেখে আমি চুকনগর কলেজের মাঠে চলে এলাম। এখানে এসে দেখলাম শুধু লাশ আর লাশ। হাজার হাজার লাশের মধ্যে হঠাৎ করে আমার চোখে পড়লো একটি শিশু মায়ের দুধ পান করছে। কিন্তু আশেপাশে কোন লোক নেই। তখন আমি চিৎকার দিয়ে বললাম এই বাচ্চাটা কাদের? তোরা নিয়ে যা। "বাচ্চাটাকে কাঁধে নিয়ে আমি যখন এগুচ্ছিলাম তখন দেখি একটা লোক এগিয়ে আসছে। ভাবলাম বাচ্চাটা বুঝি লোকটার কিন্তু লোকটা জানালো বাচ্চাটি তার নয়। তখন আমি বললাম, "তুমি বাচ্চাটি নিয়ে যাও। পারলে ওর বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে দিও। আর না হলে তুমিই বাচ্চাটিকে লালন-পালন করো।" লোকটি বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে গেল।

বেলা তখন আনুমানিক তিনটা। আমি আবার বাবার লাশের পাশি গিয়ে উপস্থিত হলাম। চিন্তা করলাম বাবাকে কিভাবে দাফন করবো? কাফনের কাপড় পাব কোথায়?

যাই হোক আমি আমার বাবার লাশ দাফন করে, আমি চুকনগর বাজার, কলেজ, নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ঘুরে দেখলাম। হাজার হাজার লোক মরে পড়ে আছে। সকাল থেকে গুলি শুরু হয়ে দুপুর পর্যন্ত চললো। নদীর দু পার রক্তে রঞ্জিত হলো।



রসবালা গাইন
পিতা : সথী চরণ মিস্ত্রি
বয়স : ৫০/৬০
পেশা : গৃহকাজ
গ্রাম : বসিরাবাদ মিস্ত্রি বাড়ি
থানা : বটিয়াঘাটা।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে, দিনে দিনে কেবল অত্যাচার বাড়ছিলো। এমনকি বাড়িঘরে আগুন দেয়া শুরু হয়ে যায়। গ্রামগুলো ক্রমে জনমানুষ শূন্য হয়ে পড়ে। স্বামী, সন্তান, দেবর, ননদসহ সবাই ভারতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবত তিন তারিখের দিকে বাড়ি থেকে চুকনগরের উদ্দেশ্যে রওনা করলাম নৌকায় করে।

চুকনগরে পৌছে দেখি চারিদিকে কেবল মানুষ আর মানুষ। চুকনগর বাজারে কোন জায়গা ফাঁকা ছিল না। চুকনগরে পা দিয়েই গুঞ্জন শুনতে পেলাম পাকবাহিনী আক্রমণ করতে পারে। কেউ কেউ বললো অন্য কোথাও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে।

আনুমানিক বারোটার দিকে শুরু হয়ে গেল পাকবাহিনীর গুলিবর্ষণ। সম্পূর্ণ অরক্ষিত, অসহায় অবস্থায় নিরীহ মানুষগুলোর ওপর গুলিবর্ষণ চলতে থাকে। আমার স্বামী, ছেলে, ভাসুরসহ আমাদের বাড়ির ছয়জন মারা যান চুকনগরে। রাইফেল, স্টেনগান ব্যবহার করে এবং অনেককে বেয়নেট দিয়েও আঘাত করে। যেদিকে তাকাই কেবল লাশ, রক্ত আর মুমূর্ষু মানুষের আর্ত চিৎকার। খুনী পাকিস্তানিরা আনন্দের সাথেই চলে গেল। এত রক্ত আর লাশ দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। পরে সবাই ইন্ডিয়ায় চলে যাই, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার পর স্বাধীন দেশে ফিরে আসি।



বকুল দাসী
পিতা : জনক চন্দ্র রায়
বয়স : ৬০
গ্রাম : খড়বুনিয়া
থানা : ডুমুরিয়া।

সে দিন ছিল বৃহস্পতিবার। জ্যৈষ্ঠী মাস তারিখটা মনে নেই। সকালবেলা আমরা 'চান করে কাপড় নাইড়ে দিলাম। তখন সমানে গুলি আরম্ভ অইয়ে গেল। সব ঐ ছুটাছুটি কইরা গেল। আমাগে ঐ গাঙ্গের চরে নিয়া গেল। গাঙ্গের চরে নিয়ে গেলেও করছে কি গুলি ঐ মাতার উপর দিয়া চইলা বেড়াইল। কারও চোখে লাইগা গেল। একটা গুলি আমার স্বামীর গায়ে লাগলো সাথে সাথে আমার স্বামী মারা গেল। আমার তিন বছরের শিশু ছেলেও মারা গেল। প্রচুর লোক মারা গেল। আমার ছেলে তার বাবার কোলে ছিল গুলিতে তার মাথার খুলি-টুলি উড়ে যায়।'

স্বামী ও সন্তানের লাশ ফেলে আমরা পালিয়ে এলাম কিছু দূরে।

'সন্ধ্যে অয়ে গেল। আমরা কান্দাকাটি করতেছিলাম।' আমার শাশুড়িও আমার সাথে ছিল। আমরা এক বাড়ির বাগানে রাত কাটালাম। পরদিন সকালে এক লোক আমাদের বাড়ি পৌছে দিল। পরে মুসলমানদের বাড়িতে কাম কাজ করে, কোনভাবে আমাদের জীবন চলে যাচ্ছিলো। সেই থেকে আমরা দুঃখে-কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। কেউ কোনদিন আমাদের খবর নেয়নি। আমার স্বামী-সন্তানকে যারা বিনা অপরাধে মারলো এমনকি সৎকার পর্যন্ত করতে দিল না, আমি তাদের বিচার চাই।



কালিদাসী রায়
পিতা : নিবারণ মণ্ডল
বয়স : ৬০
পেশা : গৃহকাজ
গ্রাম : আলাদিপুর।

'৭১-এ আমি একজন গৃহিণী। "রাত্রে মিলিটারিরা আসতিছে, গুলি-গোল্লা হবি, বাড়ি অইত্যাচার করতিছে, দাঁড়ানো যাচ্ছে না"—এ অবস্থায় আমরা চুকনগর হয়ে ভারতে যাব বলে আমার স্বামী, দুই ছেলে, এক মেয়ে, ছেলের বউ এবং আমিসহ প্রায় ৫০/৬০ জন লোক একত্রে সেদিন রওনা করেছিলাম। চুকনগর পৌছাবার পর বেলা দশটার সময় পাকসেনারা গাড়িতে করে সেখানে এলো। এসেই লোকজনকে লাইনে দাঁড়াতে বললো। "আবাদী মানুষ তো বহু, লাইন দিলে

কি করবে তা তো আমরা বইলতে পারি না।" তারপর পরই তারা এলোপাতাড়ি গুলি করতে লাগলো। গুলি যখন শেষ হয়ে গেল তখন ওরা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানুষকে মারতে থাকে। আমার পরিবারের আমার বাবা দেবেন রায়, বড় ভাই কেশব রায়, প্রফুল্ল রায়, কার্তিক রায়, শিবপদ রায় সেদিন সেখানে মারা যায়। তাছাড়া আমার স্বামী কার্তিক রায়ের ডান চোখে লাগলে সেও সেখানে মারা যায়। মহিলাদের মধ্যে যারা মারা গিয়েছেন তারা বেশিরভাগই ক্রসফায়ারে পড়ে। "শিশুরা কানলি গুলি করবে, সেজন্য বাচ্চাকে কোলেরথে ছাইড়ে দিছে জলে। ছটফট কইরে ডুবে গেছে তারা।" সেদিন আমিও আহত হই। আমি তখন খেজুর গাছের নিচের জলের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম। চোখের ওপর ভুরুর কাছেই আমার গুলি লাগে।" রক্ত ছুটছিল। কোনে ডাক্তার-কবিরাজ পাব? "চুকনগরের গাঙ্গপাড় অইয়া কিভাবি বাড়ি (আলাদিপুর) গেলাম বলতে পারিনে।" সেখানে আমার মেয়ে কাপড় দিয়ে চোখের ওপরের অংশটি বেঁধে দেয়। কিন্তু বাড়িতে যেয়ে থাকতে পারি নি। বড় নৌকা ঘাটে বেঁধে রেখে সেখানকার প্রতি বাড়ির সমস্ত মালপত্র পাকিস্তানিরা লুটপাট করে নৌকায় উঠিয়ে নিচ্ছে। তাই সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম মেয়ের শ্বশুর বাড়ি শামুক-উত্তার। বাচ্চা দুটো ছোট ছোট—সেখানে আমার বাবা লোক পাঠিয়েছিলো, তাদের সাথে ভারতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা করেছি। বদরতলা যাবার পরে সেখানে কিছু বাঙালি এবং পাকিস্তানি সৈন্যরা মিলে বাধা দেয়। তখন এক বাঙালি ভদ্রলোক ওদের কি বলাতে আমাদেরকে ছেড়ে দেয়। সেখানে আমরা অনেক লোক ছিলাম। এ ঘটনার পর সেদিন আমরা অন্যদের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করি। সঙ্গে জিনিসপত্র যা ছিল সব সেখানেই পড়ে রইলো। এজন্যই বলতে হয় সেদিনের ঘটনার জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার হওয়া উচিত।



অনুকুল চন্দ্র মণ্ডল
পিতা : শ্রী দূর্গাচন্দ্র মণ্ডল
বয়স : ৬০
পেশা : কৃষিকাজ
থানা : ডুমুরিয়া।

আমরা নৌকা পথে এখানে (চুকনগর) এসে একটা মাঠ ছিল সে মাঠে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। সেখানে বহুজন ছিল। একটা ট্রাক এলো। ট্রাক আসার পর গুলি শুরু হয়ে গেল। আমার বাবা-মা, আমার খোকা (ছেলে), খোকার মা ছিল। হৈ চৈ শুনে সবাই এদিক-সেদিক দৌড় দিলো। মাকে নিয়ে ফিরলাম। বাবার দিকে লক্ষ্য করতে পারিনি। রাস্তায় সেনাবাহিনীর ৭/৮ জন 'টমিগান' না কি বলে ৪/৫টা গুলি বের হয় একসাথে এদিক-সেদিক মারতে লাগলো। 'মাথার চুল দিয়ে বাতাস খেয়ে

যাতি লাগলো গুলি।' অনেক দূর কুটিমারির বিলের ভেতর দিয়ে যেয়ে একটা বড় জায়গায় আশ্রয় নেই। ঐ খানেরা চলে গেলে ফিরে এসে দেখি বেহাল অবস্থা। কারো বাচ্চা থুয়ে গেছে, কারো পরনে কাপড় নেই, শুধু সায়া আছে। এই অবস্থায় দৌড়াদৌড়ি, কান্নাকাটি করে সব রাস্তা দিয়ে 'যাতি' লাগলো। আমার বাবাকে আর পেলাম না খুঁজে, গুলিতে মারা গেল! আনুমানিক ৭/৮শ' লোক মারা যায়। ওখান থেকে আমরা দেশে যেয়ে পরে খড়িবুনিয়া হয়ে ভারতে চলে যাই। 'বিচার তো চাতি হয় বা করতি হয়, যদি ব্যবস্থা করতেন!'



মওলানা মোহাম্মদ আলী
পিতা : আলহাজ্ব শেখ হারুনুর রশীদ
বয়স : ৬০
পেশা : অধ্যাপনা, চুকনগর কলেজ
চুকনগর।

হানাদার বাহিনী মাঝে মাঝে আসতো। এদিক-সেদিক, এখানে-সেখানে অপারেশন করে যেতো। ফলে লোকজন ভারতমুখী হয়ে গেছিলো। আমি সেদিন সকালে আমার মোটর সাইকেল নিয়ে যশোর যাই। ফেরার পথে যশোর থেকে ৪টি কন্টেইনারে ১০ গ্যালন পেট্রোল নিয়ে মনিরামপুর আসলে সেখানে এক ড্রাইভার বললো—"এই নিয়ে সামনে যাবেন না। খান সেনারা কয়েকটা গাড়ির বহর নিয়ে আসছে। তারা চুকনগরে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ফিরছে। আপনি আর ওদিকে যাবেন না।" তখন আমি মনিরামপুর কলেজের ওখান দিয়ে গ্রামের মাঝে যেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। ঘন্টাখানেক পরে গাড়ি যশোরের দিকে চলে গেলে ফিরে আসি। রিপোর্ট পাই ঘটনাটি দশটা-এগারোটায় ঘটে। খানেরা বাজারের কাছে গাড়ি রেখে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গ্রামের ভেতর যায়। আমি বেশিক্ষণ দেখতে পারছিলাম না। বাজারে যেয়ে যে লোমহর্ষক কাণ্ড দেখি তা সহ্য করা যায় না। আনুমানিক ২-৩শ মানুষ মরে পড়ে আছে। এর মাঝে ৬-৭শ' স্থানীয় বাকিরা সব অস্থানীয়। বেশি দূর যাওয়ার সাহস হয় না। আমার ধারণা ১-২ হাজার মানুষকে পাকিস্তানিরা হত্যা করে।

পরে একটু শুনেছিলাম এখানে খেয়ার আদায়কারী একজন খাঁ সাহেব ছিলেন, বিহারী। তার সাথে কারো ভাড়া নিয়ে কি গণ্ডগোল হয় তখন তার প্ররোচনায়ই সেনাবাহিনী এখানে আসে।



প্রবোধ চন্দ্র রায়
পিতা : মৃত সহদেব রায়
বয়স : ৫৮
পেশা : ব্যবসা (কাপড়ের দোকান)
পূর্ব পাতিবুনিয়া
চুকনগর।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার। মুক্তিযুদ্ধ চলছে। আমরা প্রায় ৪/৫শ নৌকা নিয়ে পুটিয়ারা ঘাটে নামলাম। ঘাট ছেড়ে বড় রাস্তা ধরে ৪/৫টি পরিবার হেঁটে যাচ্ছি। এমন সময় পাকবাহিনীর দুটো ট্রাক সাতক্ষীরার দিক থেকে এসে দাঁড়াল। একটু পরে ফাঁকা আওয়াজ করলে লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পাক সৈন্যরা একটা গাড়ি নিয়ে খেজুর বাগানের কাছ থেকে তিন-চারটি মেয়েকে গাড়িতে তুলে নিলো। এরপর প্রতিটি লাইনে ২০ থেকে ৩০ জন করে একসঙ্গে ১০টি করে লাইন করে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করতে শুরু করে।

এই অবস্থা দেখে আমি, আমার দু' মামা (বিন্দু, নিশীকান্ত)সহ নদীতে ডুব দিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলাম। বিন্দু মামার ঘাড়ে ছিল তাঁর ৪/৫ বছর বয়সের ছেলে। হঠাৎ একটি গুলি এসে লাগলো ছেলেটার মাথায়। তৎক্ষণাৎ শিশুটি মারা যায়। এরপর গুলি লাগে নিশীকান্তের, আমার পাশেই ছিল, একসঙ্গে সাঁতরিয়ে যাচ্ছিলাম। পিঠে গুলি লেগে, নাড়িভুড়িসহ পেট দিয়ে বের হয়ে যায়। তারপরও নিশীকান্ত "আমার হাত-পা জড়ায় ধরে বললো, আমায় বাঁচাও।" যাহোক তাকে আর বাঁচানো গেল না। ঘণ্টা দুয়েক পরে গুলি-গালা থেমে গেলে দুই/তিন ঘণ্টা পর গিয়ে দেখি, "বহু লোক মইরা পড়ে আছে। যা দেখলাম মা মইরা গেছে শিশু বাইচে আছে। মরা মায়ের দুধ খাচ্ছে। দুধ খাওয়ার জন্য কানতেছে।"

এত লাশ যে হাঁটার কোন জায়গা নেই। "মরার উপর দিয়ে হাঁটি চলি আসলাম।" পাকবাহিনী কম করে ৫/৬ হাজার মানুষ হত্যা করেছে। এই হত্যার বিচার হওয়া উচিত।



নরেন্দ্রনাথ গাইন
পিতা : অবিনাশ চন্দ্র গাইন
বয়স : ৫৭
পেশা : চাকুরি (পুলিশ সুপার)
গ্রাম : দাউনিয়া
ডাকঘর : ছরঘটিয়া
থানা : বটিয়াঘাটা।

"আমি খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানার দাউনিয়া গ্রামের বাসিন্দা। চুকনগরে বাংলাদেশের সবচেয়ে জঘন্য এবং ন্যাক্কারজনক গণহত্যায় আমি আমার বাবা, কাকা, চাচাতো ভাই, জেঠাতো ভাই, তার বৌ ও ছেলে, পিসেমশাই, পিসতুতো ভাই এবং আমার এক ভাইপোকে হারিয়েছি। যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী আমি তাদের বিচার অবশ্যই চাই।"

চুকনগরে গণহত্যার তারিখটা ছিল ২০মে। ঘটনার দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে চুকনগর সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি এবং তার পূর্ববর্তী কিছু ঘটনার কথা বলবো।

আমি তখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির এম.কম. ম্যানেজমেন্টে ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। ৩ মার্চ আমাদের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। যথাসময়ে এক পেপার পরীক্ষা হওয়ার পর ৪ মার্চ আর পরীক্ষা আর হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলমাল শুরু হলে গ্রামে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বেডিংপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে রেখে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও স্বল্পসংখ্যক পোশাক নিয়ে হেঁটেই রওয়ানা হই। আবদুল্লাহ পুর স্টেশনে পৌছে সেখান থেকে ট্রেনে যশোর পৌছি। কিন্তু রেললাইন উপড়ে ফেলায় এবং স্থলপথে কোন ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে যশোর টাউন ধরে হাঁটছিলাম, এক ভদ্রলোক দেখে আমাদেরকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নোয়াপাড়ায় এসে নৌকা করে বাড়ি (দাউনিয়া, বটিয়াঘাটা) পৌছি।

সে সময় আমি, মি. হারুনুর রশীদ ও অন্যান্যরা মিলে মুক্তিযুদ্ধকে সংহত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করি। ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিটি হলগুলোতে চিড়া, গুড়, ডাব এবং শুকনো খাবার সংগ্রহ করে রাখছিলাম মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে। কিন্তু আমাদের গ্রামেরই জহরনাথ চক্রখালী হাইস্কুলে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্প করেছে এ খবর পেয়ে পাকসেনারা খুলনা থেকে গানবোট নিয়ে স্কুলের অনতিদূরে নদীতে অবস্থান নেয়। স্কুলকে লক্ষ্য করে মর্টারে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। গ্রামের লোকজন তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। আমরা আত্মীয়স্বজন নিয়ে প্রাণের ভয়ে নদীর ওপাড়ে চলে যাই। এর কয়েকদিন অব্যহতির পর আমাদের ইউনিয়ন এবং এর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে পাকসেনারা গানবোটে এসে ফায়ারিং শুরু করে। পুরো এলাকায় বিশৃঙ্খলা এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বটিয়াঘাটা থানার অধিকাংশ ইউনিয়নের লোকজনই ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন এই এলাকায় প্রচুর নৌকা ছিল। যতটা সম্ভব জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে পুরো এলাকার অসংখ্য লোক ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে চুকনগর জড়ো হয়। সেখানে যার কাছে যা ছিল তাই খেয়ে নিয়ে লোকজন রওয়ানা করবে এমনি প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনি চুকনগরের বড় রাস্তা ধরে পাকসেনারা এগিয়ে এসে এসএমজি দিয়ে এলোপাথারি গুলি করে। যারা গুলিতে মারা যায়নি তাদেরকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। সেদিন প্রায় ৪ হাজার লাশ নদীতে ফেলা হয়েছিল। সুতরাং এ ঘটনার জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত।



সুধীর দাস
পিতা : ভগীরথ দাস
বয়স : ৫৫
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল ২৫ বছর। ঐ সময় আমি কৃষিকাজ করতাম। চুকনগর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আমি নিজ চোখে দেখেছি। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার, জ্যৈষ্ঠ মাসের ৫ তারিখ। বেলা দশটা-এগারোটার দিকে সাতক্ষীরার দিক থেকে দুটো ট্রাক এসে আমাদের চুকনগর মাঠে এসে নামে। ঐ দুটো ট্রাক থেকে আনুমানিক দশ/এগারো জন লোক নেমে গুলি করতে শুরু করলো। প্রথমে দাঁড়িয়ে গুলি করলেও পরে মাঠে গিয়ে পানিতে নেমে গুলি করতে লাগলো। বেড় দিয়ে ঘিরে গুলি করছে। এই সময় ঐখান থেকে 'পালাই' চলে গেলাম। আধা মাইল দূরে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

আমার বাবা ভগীরথ দাস, বয়স ছিল ৬০ বছর। "তিনি ওদের পা জড়াই ধরতি গেইল। ধুতি পড়নে ছিল। তা যেই পা জড়াই ধরিছে আর অমনি গুলি করে দিল। বাবার সাথে কালাচানরে আবার দিগম্বর করে মাইরেছে। সেদিন চুকনগরে পাঁচ-ছয় হাজার লোককে ওরা মাইরেছে। যারা মাইরেছে তারা সবাই উর্দুতে কথা বলিছে। তাদের সাথে কিছু বেহারী ছিল। যারা মারিছে তাগো সবাই ছিল বাহিরের, স্থানীয় লোকজন অল্পই মরিছে।" দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোন সরকার বা সংগঠন আমাদের নাম-ঠিকানা নিতে আসেনি। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।



কৃষ্ণপদ রায়
পিতা : মৃত অশ্বিনীপদ রায়
বয়স : ৫৩
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : শিবনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

এলাকার পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল। চৈত্র-বৈশাখ মাস থেকে যেখানে-সেখানে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ এগুলো শুরু হয়। গরু-বাছুর নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে নারী নির্যাতন এই ধরনের ঘটনা ঘটছিলো।

আমরা বৃহস্পতিবার চুকনগর আসি। অনেকে বুধবার এসেছিলো। সে সময় একটা জনরব উঠেছিলো যে বৃহস্পতিবার সবাই ভারতে চলে যাবে। সেদিনই পাকিস্তানি সৈন্যরা সকাল দশটা সাড়ে দশটার দিকে চুকনগর আসে। আমরা নৌকা থেকে নেমে কেবল ভাত-টাত খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। ঠিক সেই সময়ে প্রায় ৮-১০ জন মিলিটারি ট্রাক থেকে নেমে আমাদের লাইনে দাঁড়াতে বলে। লাইন দেওয়ার পর যখন ফাঁকা আওয়াজ করে তখন মনের মধ্যে ভাল ঠেকলো না। বাবা আমার সামনে ছিল। বাবাকে বললাম 'বাবা ভাল মনে হচ্ছে না।' সে বললো যে, 'না ওরা কিছু বলবে না। আশ্চর্য, চুপ করে থাক, কিছু বলবে না।' তখন ফাঁকা আওয়াজ করলে আমি ওখান থেকে নদী সাঁতরিয়ে চলে গেলাম। আমি যখন সাঁতরিয়ে যাই তখন আমার খোকার বয়স এক বছর। আমি আমার বাচ্চাকে নিয়ে দৌড়ে গ্রামের ভিতরে যেয়ে একটা গাছের 'মুড়ো'র ভিতরে ঢুকে ছিলাম। একটু পরে মিলিটারি এসে কিন্তু গাছের পথ ধরে লাফ দিয়ে দিয়ে ঐ আড়ালটা পার হয়ে ওপাড়ে যেতে লাগলো। আর স্থানীয় ৫-৭ জন লোক মিলিটারিদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। তারা ৭-৮ জন পাকিস্তানি মিলিটারির সাথে 'নারায় তকবির আল্লাহু আকবার' এই সমস্ত বলতে বলতে চলে যায়। আর্মিরা বিকাল ৪টার দিকে চলে গেলে বাচ্চাটাকে নিয়ে ফিরে এসে দেখি বাবা পড়ে আছে। মা লাশ নিয়ে বসে আছে। বাবাকে দেখে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। তখন আমি কি করি, দেখি একটা নৌকা ভেসে যাচ্ছে তখন। ঐ নৌকায় তাদের উঠিয়ে দিয়ে বললাম যে, 'তোমরা বাড়ি যাও। ফ্যামিলিতে তো আরও লোক আছে, আমি তাদের নিয়ে আসি।' আমি লাশ খুঁজে খুঁজে কারো লাশ পেলাম না। ওখান থেকে রাতে গেলাম কাঁঠালতলা। সেখানে এক ভদ্রলোক রাজা রশিদ, উনি আমাকে ৫-৭ জন লোক দিয়ে 'যত্নপান' করে রাতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠলে একটা লোক এসে বললো, যে তোমাদের লোকজন সব বাড়ি চলে গেছে।

চুকনগরের লোকজন কম মারা যায়। সেখানে বাইরের লোকজনই বেশি মারা গেছে। আমার মনে হয় যে চুকনগর বাজারেই ৭-৮ হাজার লোক মারা যায় এবং লাশগুলো পরে চুকনগর নদীতে ফেলে দেয়। মহিলাও ৮-১০ জন মারা পড়েছিলো। ঐ সময়ে শুনেছিলাম অনেক মেয়েছেলেকে ঐ নদীর ঘাটে নির্যাতন করেছিলো। যারা এই হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের সাথে জড়িত আমি তাদের মৃত্যুদণ্ড চাই।



হরেন্দ্র নাথ গাইন
পিতা : মৃত অবিনাশ চন্দ্র গাইন
বয়স : ৫৩
পেশা : চাকরি
গ্রাম : দাউনিয়া কাঁদ
থানা : বটিয়াঘাটা।

তারিখটা ছিল ২০ মে ১৯৭১, সেদিন আমি চুকনগরে

ছিলাম না। ২৫ মার্চ ঢাকায় ক্র্যাক ডাউন হওয়ার এক বা দু'দিন পরই বাগেরহাটের তৎকালীন ই.পি.আর .বাহিনী আর্মসসহ একত্রিত হয়। পাক আর্মিরা তখন এখানকার রেডিও সেন্টারটি দখল করে নেয়। আমরা তখন ইউনিভার্সিটির (রাজশাহী) হাতি বাগন এবং খালের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসি। পরবর্তীতে ই.পি.আরদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ২৭ তারিখ রাতে পাক আর্মিদের ওপর অপারেশন চালাই। মুক্তিযোদ্ধারা বটিয়াঘাটা এলাকায় সংঘটিত হয়েছে এ খবর পেয়ে পাক আর্মিরা ১৪ এপ্রিল দু'টা বা তিনটা গানবোট নিয়ে চক্রাখালী স্কুলের সামনে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে শেলিং শুরু করলে গ্রামের লোকজন গুলির শব্দ শুনে নদী পার হয়ে ওপাড়ে (ভারতে) চলে যায়। আর্মিরা চলে যাওয়ার পর আমরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম ভারতে চলে যাওয়ার। আমার বড় ভাই নরেন্দ্র নাথ গাইন (২৫/২৬) এবং বৌদিসহ কালিগঞ্জ দিয়ে হাসনাবাদে (ভারতে) পৌঁছাই। পরবর্তীতে আমি মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে ভর্তি হই ট্রেনিং নেবার জন্যে।

"চুকনগর গণহত্যায় আমার পরিবারের অনেকে নিহত হয়। তার আসল ভিকটিম হলাম আমি। ৩০ বছর ধরে গণহত্যায় নিহত পরিবার-পরিজনকে লালন-পালন করছি।" চুকনগর এলাকাটাকে আমি আগে থেকে চিনতাম। এ জায়গাটাকে তৃণভূমি বলে। যশোর থেকে এর সরাসরি যোগাযোগ। তাছাড়া সবদিক থেকেই এর যোগাযোগ ছিল। তবে রাসপাল, বটিয়াঘাটা এলাকা থেকে নৌপথেই চুকনগর যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন। গ্রাম অঞ্চলে তখন সব বাড়িতেই নৌকা ছিল।

বটিয়াঘাটা থানার বিভিন্ন গ্রামে সে সময় পাক আর্মিরা প্রায় প্রতিদিনই আক্রমণ করতো। প্রতিদিনই গোলাগুলির শব্দ শোনা যেত। গ্রামের লোকজন প্রাণভয়ে সিদ্ধান্ত নেয় ভারতে চলে যাওয়ার। চুকনগর হয়ে বর্ডার ক্রস করে ভারতে যাওয়ার রাস্তা ছিল বলে প্রত্যেকেই চুকনগর জড়ো হচ্ছিলো। বরিশালের মঠবাড়িয়া, শরণখোলা, খুলনার রামপাল, বটিয়াঘাটা এসব এলাকার লোকজন সেদিন চুকনগরে ছিল। লোকজন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছিলো। এমনি সময় পাক আর্মিরা ওখানে আক্রমণ করে। বাঁচার জন্য লোকজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্রমাগত ব্রাশ ফায়ারে সেখানেও তারা টিকতে পারে নি। জলের রং সেদিন রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। শিশু এবং মহিলারা ক্রস ফায়ারে পড়ে মারা যায়। "আমার এক জেঠাই মা (৫০/৫২) তার নাতিকে বুকে জড়াইয়ে ধরে বলছিলো যে তাকে তোমরা মেরো না। সবাইকে যদি মারো আমরা কোথায় যাব? তারপরও তাকে গুলি করায় সেখানে আমার জেঠাই মা মারা গেছিলো।" পরবর্তীতে আহতদের আত্মীয়স্বজন নৌপথে তাদেরকে নিয়ে হিমলাগঞ্জ হয়ে ভারতে যায় এবং সেখানে তাদের চিকিৎসা হয়।

সেদিনের ঘটনায় আমার বাবা অবিনাশ চন্দ্র গাইন (৫০/৫২), কাকা (৪৫), জেঠাই মা (৫২), কাকার বড় ছেলে রঞ্জিত গাইন (৪০/৪৫), ভাইপো বিনয় গাইন (২২/২৪), তার বাবা ঈশ্বর গাইন (৪০/৪৫), পিসতুতো ভাই ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (৩০), পিসেমশাই অধর মণ্ডল (৪০/৪৫) এরা সবাই মারা যায়। এতে আমার বা অন্যদের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পূরণীয় নয়। সুতরাং "আমি অবশ্যই এর বিচার চাই এবং হাজার বছর ধরে চাইবো।"



মোঃ আনসার আলী সরদার
পিতা : মৃত মোঃ ইবাদ আলী সরদার
বয়স : ৫২
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে চুকনগরে যে গণহত্যা হয়েছিলো, আমি হত্যাকাণ্ডের পর লাশ অপসারণ করি। দিনটি ৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, আমি বাড়িতে ছিলাম। সকাল ৯/১০টার দিকে পাক আর্মির দুটো গাড়ি আসে (গাড়ির সংখ্যা পরে শুনেছি)। মহিলারা বাড়িতে রান্না-বান্না করছে। বাচ্চাদের গোসল দিচ্ছে, কেউ খাওয়া-দাওয়া করছে। পাক আর্মিরা 'মাল্‌তি' গ্রামে ফায়ার করে। গুলির শব্দে যে যার মত পালাতে থাকে। শুনলাম একটা গাড়ি বাজারে ঢুকে (চুকনগর) গুলি করছে। "আমাদের পরানে আর পানি থাকলো না।" আমাদের বাড়ির সামনে চার সাড়ে চার হাজার লাশ হবে, সব মিলিয়ে ৮/১০ হাজার মারা যায়। রায়পাড়া, নন্দীপাড়া (চুকনগর বাজারের পাশে), চুকনগরে লাশ আর লাশ। হত্যাকাণ্ডের পর আমি রায়পাড়া বাগানে যাই, অবস্থা দেখার জন্য। বাগানের ভেতর লাশের জন্য পা ফেলার জায়গা নাই। গুলিবিদ্ধ একজনকে দেখি 'জল, জল এরুম করতেছে।' আমি গামছা ভিজিয়ে এনে তার মুখে পানি দিতে যাই, তখনি সে মারা যায়। বাঁচার জন্য অনেকেই চেয়ারম্যান এ.বি.এম. শফিকুল ইসলামের জমির 'ঘানা'র (বড় গর্ত) ভেতরে লুকায়। একজনও বাঁচতে পারে নি। সবাই লাশ হয়ে পড়েছিলো। আমরা এ লাশ দড়ি দিয়ে বাঁশে বেঁধে নদীতে ফেলি। "বান্দিছি আর ফেলাইছি।" এক গ্রুপে দুজন করে এ কাজ করি। আমার সাথের জন, বাবর আলী আমার পাশেই তার বাড়ি। আমরা দুজনে দুশোর ওপর লাশ নদীতে ফেলি ভদ্রা নদীতে। ভয়ে কেউ নদীতে নৌকা চালাতে পারেনি। চারিদিকে শুধু রক্তের গন্ধ। হত্যাযজ্ঞে আহত হয়ে দু-একজন বেঁচেও আছে। এরকম একজন শৈলান। বাড়ি বটিয়াঘাটা কাঠামারি গ্রামে। তার হাতে গুলি লেগেছিলো। আমার ফুফু চরে গরু আনতে গিয়ে তাকে দেখে আমাদের এসে বললে আমরা তাকে নদীর পাড়ের চর থেকে উদ্ধার করি। তাকে নিমপাতা, নিশিন্দা পাতা দিয়ে ধুয়ে বরিকের সেঁক দেই। তখন নিলাময় পাউডার ছাড়া কোন ওষুধ ছিল না।

এ হত্যাকাণ্ডে নিহত বেশির ভাগই রংপুর, শাহপুর, বটিয়াঘাটা, দাকোপ এলাকার। তারা ভারতে যাওয়ার জন্য এখানে এসেছিলো। হত্যাকাণ্ডের পর থেকে অদ্যাবধি এখানে কেউ কোন সাহায্য করে নি। আমি এর বিচার চাই। আমি সাক্ষ্য দেব।



সুধীর মণ্ডল
পিতা : শরৎ মণ্ডল
বয়স : ৫১
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : তেঁতুলতলা
থানা : বটিয়াঘাটা।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহের এক বৃহস্পতিবার ভারত যাবার উদ্দেশ্যে চুকনগরে আসি। রাজাকার-আলবদরদের অত্যাচারেই গ্রামের বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। চুকনগরে পৌঁছে নৌকা থেকে নেমে যখন হাঁটতে শুরু করেছি শুনলাম 'মিলিটারি' এসে গেছে। অকস্মাৎ শুরু হয়ে গেল গুলি। চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি। হঠাৎ গুলি এসে লাগে আমার মুখে। দাঁত পড়ে যায়। জিব কেটে যায়। দুই-তিন দিন অজ্ঞান ছিলাম। জ্ঞান ফিরে দেখলাম আমি কলকাতার টালিগঞ্জের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসই হাসপাতালে ছিলাম। অবশেষে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। কিন্তু আমি তখনও সুস্থ হতে পারি নি। বাবা-মা ডাক্তারের অমতে আমাকে দেশে নিয়ে আসে। "আমার এই এক পাশ পইড়া গেছে। জিহ্বা অহনে আধা। কোন কাজ করতে পারি না। কোন খাটতে পারি না।" যারা এত মানুষ হত্যা করেছে, আহত করেছে, নির্যাতন করেছে তাদের "বিচার তো চাবো। তা চাইলে পাবো কহেনে।"



নিতাই গাইন
পিতা : মৃত অবিনাশ গাইন
বয়স : ৫০
পেশা : কৃষি
গ্রাম ও থানা : বটিয়াঘাটা।

চুকনগর গণহত্যার দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় আমি সমাজসেবা ছাড়া অন্য কোন কাজ করতাম বলে মনে হয় না। আমাদের বৈঠাকাঠা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা বলে বরিশাল, রামপাল, বাগেরহাটসহ আরো অঞ্চলের বহু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক 'আইসা' আশ্রয় নেয়। ১৮ তারিখে বাদামতলা, ফুলতলার আশেপাশের গ্রাম ও ইউনিয়নগুলোতে গুলি হওয়ায় যত লোক আশ্রয় নিয়েছিলো তারা প্লাস আমাদের এলাকার লোক সবাই ১৯শে মে রওনা হয়ে রাত্রিবেলা চুকনগর এসে চুকনগর বাজার, স্কুল, গাছপালা যে যেখানে পারে অবস্থান নেয়। কিছু লোক

বৈঠাকাঠায় থেকে যাওয়ায় আমি তাদের নিয়ে রাত ৪টার সময় রওনা হয়ে বেলা ৯টায় চুকনগর পৌছাই। সব লোক নৌকা করে এসেছিলো। পাকা রাস্তা ধরে যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা হতে চুকনগর বাজারের মোহনার মুখে পৌছানো যায়। হাজার হাজার লোক তখন নদীতে নৌকায় ছিল।

আমি ঐখানে নামার পর আমার পরিবারবর্গ ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তখন রান্না চলছিলো। আমি বললাম যা রান্না হয়েছে ঐ খেয়ে আমাদের যেতে হবে, দেরি করা যাবে না। ঐ 'সেগুলান' খাওয়া-দাওয়া করে আমরা গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। তখন বেলা ১০টা কি সাড়ে ১০টা বাজে। এই সময় আর কি, গুলি শুরু হলো। আমরা ছিলাম বাজারের উত্তর-পূর্ব কোণায়, নদীর পাশে। আমরা যতদূর অনুমান করতে পেরেছিলাম এবং পরবর্তীতে আমি যেটা দেখেছিলাম খান সেনারা গাড়িতে করে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসেছিলো। আসার পথে সাতক্ষীরা বা অন্য কোন জায়গা থেকে ওদের সাথে ৮/১০ জন বিহারীও এনেছিলো। বিহারী মুসলমানদের সাথে লুটপাটের স্বার্থে কিছু স্থানীয় লোকজনও যোগ দেয়। আমার পাশ দিয়ে ২/৩ বার পাকিস্তানি আর্মি যাবার পথে আমি চেষ্টা করেছিলাম যে কারো নাম উদ্ধার করা যায় কি না। কিন্তু যেখানে ওদের নেমপ্লেটগুলো থাকার কথা সেখানে কারো নাম ছিল না।

আমি মনে করি খান সেনারা সর্বপ্রথম ঐ বাজারের মোড় থেকে গুলি করতে শুরু করে। ৪টি গ্রুপে ভাগ হয়ে যায়, ৪ জন মিলিটারি কমান্ডার দিক নির্দেশ করছিলো। একটা গ্রুপ পাকা রাস্তা ধরে গুলি করতে করতে চলে যায় পূর্ব দিকে। আর একটা গ্রুপ পাকা রাস্তা ধরে গুলি করতে করতে চলে যায় সোজা পশ্চিম মানে যশোরের দিকে। আর একটা গ্রুপ গুলি করতে করতে সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জের দিকে যে রোড সেই রোডের দিকে যায়। একটা গ্রুপ গুলি করতে করতে বাজারের ভিতরে ঢোকে। কিন্তু মূল বাজারের ভিতরে ঢোকে না। এক পাশ দিয়ে রাস্তা আছে সেদিকে ঢুকে নদীর পাশ দিয়ে চলে যায়। নদীর পাশ দিয়ে গুলি করতে করতে ঐদিকে দেড় মাইল পূর্বে গিয়ে সেখান থেকে একটা নৌকায় নদী পার হয়। নদী পার হয়ে আবার উত্তর পাশ দিয়ে গুলি করতে করতে আসে। বাজারের যে উত্তর-পূর্ব কোণা সেখান থেকে নদী পার হয়ে যখন উঠে তখন আমি একটা মসজিদে আশ্রয় নেই। মসজিদে আমার বাবা, কাকা, আমার বড় কাকার বড় ছেলে বিনয়, বড় ভাই রঞ্জিত, তারপর আমার জেঠাতো ভাই ঈশ্বর, জেঠাই মা মালতি, জামাই বাবু, পিশে মশাই অধর রায়, তার ছেলে ধীরেন এরা সব বারান্দায় বসা ছিল। আমি তাদের যারা যুবক ছেলে ছিল ধীরেন, রঞ্জিত, বিনয় এদেরকে অন্য জায়গায় পাট বাগান-টাগান এইগুলোতে সরিয়ে দিলাম। বাজারের কোণা দিয়ে উঠে তারা (আর্মি) বাজারেই গুলি করা শুরু করলো। বাজারের প্রত্যেক ঘরে, বারান্দায় আবার বাজারের ভিতরে যে খোলা ঘর, চান্দি, চান্দির ভিতরেও বহু লোক ছিল। ঐখান থেকে যায় মন্দিরে, মন্দিরের পিছনে ছিল এক বটগাছ। সেই বটগাছের নিচে ১০০ জন লোক ছিল। বট গাছটা কাত হয়ে পড়ে ছিলো আর ওর নিচে বিরাট একটা গর্ত হয়েছিলো। ঐখানে আমার পিশে মশাইয়ের ছেলে ধীরেন ঐ গর্তের ভিতরে

ঐখানে ফায়ারিংয়ে মারা যায়। বেলা দেড়টার দিকে ওদের (পাকবাহিনী) গ্রুপগুলো ঐ মোড়ে সংগঠিত হতে লাগলো এক গ্রুপে। আমরা লুকিয়ে দেখছিলাম ওরা যাচ্ছে কি না। সর্বশেষ গ্রুপটি গ্রাম থেকে ফিরে এসে আবার বাজার হয়ে ঐ মোড়ে যায় এবং তারপর ওরা সাতক্ষীরা হয়ে যশোরের দিকে ফিরে যায়। তারা (আর্মি) পুরুষ লোকদেরই গুলি করে। কিন্তু আমার জেঠাই মা মালতি সে তার নাতিকে জড়িয়ে ধরেছিলো। গুলি করলে রাইফেলের এক গুলি তাকেও ভেদ করে এজন্য সে মারা যায়। পরবর্তী সময়ে শুনেছিলাম স্থানীয় একজন পুরুষ ও একজন মহিলা মারা গেছে। স্থানীয় লোকজন বেশি মারা যায় নি কারণ তারা পথঘাট চিনতো, গুলি শুরু হওয়ার পর তারা সব মাঠের ভিতরে দিয়ে দৌড়ে দূর-দূরান্ত গ্রামে বা নদী পারাপার হয়ে চলে গিয়েছিলো। মানুষ যারা মারা গেছে তারা সবাই অস্থানীয়, দূর থেকে আসছে আমার জানামতে বটিয়াঘাটা হচ্ছে এক নম্বর। তারপর হচ্ছে রামপাল। বেশি মারা গেছে আমাদের জলপাই ইউনিয়নের চন্দ্রাখালির। আরো আছে শিলমাড়ি, পুটিমাড়ি, ফুলতলা, বাসুরাবাদ, মাঠভাঙ্গা, দেবীতলা, টেংরামাড়ি। বরিশালের মঠবাড়িয়ার লোক ছিল। বাগেরহাট প্রপারের আশপাশে সব থানার লোক ছিল। আমার ধারণা লোক মারা গিয়েছে ১৫ হাজারের কম হবে না, শিশু ও মহিলার সংখ্যা কম ছিল। শিশু ১-৫ বছরের ৮/১০ জন এবং নারী ১০০-২০০ দেখেছি। আমাদের কিছু লোক আহত হলে স্থানীয় ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করে। শতকরা ৫ ভাগ লোকের এদেশের হাতুড়ি গ্রাম্য ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা হয়। অধিকাংশ শতকরা ৯৫ জনেরই মূল চিকিৎসা হয় ভারতবর্ষে যেয়ে।

বাংলাদেশের সেই স্বাধীনতার সময়কালে আমরা স্বজন হারালাম, মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধার সংগঠক হলাম। ভারত সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ সিগনেচারে আমাদের এত বড় লম্বা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিলো। সব সার্টিফিকেট আমরা গায়ে পেঁচায়ে নিয়ে এ যাবত ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু আজও পর্যন্ত চুকনগরের এতবড় নৃশংস গণহত্যার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কিছুই হলো না। তাই এই সুযোগে গোলাম আযমের মত মানুষেরা সংগঠিত হচ্ছে, পাকিস্তানি পতাকা ওড়াচ্ছে। বাংলাদেশে আবার নতুন পাকিস্তান বানানোর চেষ্টা চলছে। এটা অত্যন্ত পরিতাপ এবং দুঃখের। যারা গণহত্যা করেছিলো এবং যারা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিলো তাদের অনেকে এখনও জীবিত, এখনও তারা অনেকে বাংলাদেশে ঘোরে। তাদের বিচার হোক, এই বিচার আমরা প্রত্যাশা করি। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার অবশ্যই চাই।



সূর্য ঋষি মণি
পিতা : বাবুলাল ঋষি
বয়স : ৫০
পেশা : ভিক্ষুক
গ্রাম : ফুটিমারি।

'৭১-এ আমি একজন ভিক্ষুক। সবেমাত্র আমার বিয়ে হয়েছে। চারদিকে গোলাগুলি হচ্ছিল দেখে আমরাও অন্যদের মত ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে চুকনগরে পৌছি বুধবার বিকেলে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে দশটার মধ্যেই পাকিস্তানি সৈন্যরা এখানে গোলাগুলি শুরু করে। গুলি করলো "আমার বাবা-মা, চারটা বুন, একটা ভাইকে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা মারা পড়িলো। আমি ওদের পাও জড়ায়ে ধরিছি, মাইরো না মাইরো না বলি। কাপড় ছিড়ে গেছে, তবুও ওরা মারিছে।" লোকজন সব গুলির ভয়ে কেউ কোলে বাচ্চা নিয়ে দৌড়ে বিলের মধ্যে আশ্রয় নেয়। "কেউ ওদের পা জড়ায়ে ধইরেছে। আমার এক পুত, মাইরো না। এমনি আমায় বাড়ি বুড়ি মারো।" আমি এবং আমার বোন বাচ্চাসহ পরে জঙ্গলে জলের মধ্যে ডুবেছিলাম প্রায় দেড় ঘণ্টা। রক্তে জলের রং লাল হয়ে গিয়েছিলো। ওরা চলে যাবার পর "লাশ ডিঙ্গিয়ে আসা যায় না, এতো মানুষ, এতো মানুষ মাইরেছে।" পরে আমার দাদার লাশটাকে আমার স্বামী ও বোনের ছেলে মিলে নদীতে ভাসিয়ে দেই।

বর্তমানে আমি এবং আমার বোন বেঁচে আছি। স্বামী আমাকে ফেলে রেখে ভারতে চলে গিয়েছে। বাবার জায়গা-জমি সব লোকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে। খ্রিস্টান ফাদাররা কিছু জায়গা দিয়েছে থাকার, সেখানেই থাকি এবং এখনও ভিক্ষা করে একটি বাচ্চা নিয়ে খুব কষ্টে আছি। দাদা, বাবা মারা গেল। যারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটালো তাদের বিচার হওয়া তো উচিত।



রাসী বালা
স্বামী : অরবিন্দ বালা
বয়স : ৫০ (আনুমানিক)
পেশা : গৃহিণী
গ্রাম : কুচুবুনিয়া।

১৯৭১ সালে ৫ সন্তান ও স্বামীকে নিয়ে আমার সুখের সংসার ছিল। আমার স্বামী কৃষিকাজ করতেন। গণ্ডগোলের সময় (মুক্তিযুদ্ধের সময়) এক বুধবার

(আনুমানিক ১৯শে মে, '৭১) আমরা বাড়ি থেকে বের হয়ে চুকনগরে চলে এলাম। চুকনগরে বুধবার রাত্রি কাটানোর পর বৃহস্পতিবার সকালে যখন আমরা পাক-শাক করে খেয়ে উঠলাম তখন দক্ষিণ দিক থেকে গাড়ি করে "মেলেটারি আসলো (কোহানের মিলিটারি তা কতি পারব না)।" প্রথমে তারা পূর্বদিকে গেল, তারপর গেল পশ্চিমে। পশ্চিম দিকে গিয়ে তারা গুলি করলো। যে জায়গায় মানুষ দেখলো সেখানেই গুলি করলো। গুলির শব্দ শুনে সবাই দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো। আমার একটা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আমার স্বামী দৌড় দিতে চাইলো। একটা গুলি এসে আমার স্বামীর মুখে লাগলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। বাচ্চাটার গায়েও গুলি লাগলো। আমি বাচ্চাদের নিয়ে দৌড় দিলাম।

আমাদের টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র সব লোকজন লুট করে নিয়ে গেল। আমার যে বাচ্চাটা তার বাবার কোলে ছিল সে বাচ্চাটাকে ফেলেই চুকনগর থেকে পালালাম। পরে বর্ডারের মুখে এক বেটির কাছে ঐ বাচ্চাকে পেলাম। চুকনগর গণহত্যার দিন আমার স্বামীসহ প্রচুর লোক মারা যায়। স্বামী হারিয়ে আজ পাগলিনী। আমি এবং আমার সন্তানেরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। যারা আমাকে বিধবা করল, আমার সন্তানদের পিতৃহারা করলো, আমি তাদের বিচার দেখে যেতে চাই।



সুভাষ চন্দ্র রায়
পিতা : বিজয়কৃষ্ণ রায়
বয়স : ৫০
গ্রাম : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল ২০-২২ বছর। তখন আমি ধান-চালের ব্যবসা করতাম। ১৯৭১ সালের ১৯মে বুধবার বিকেলে আমি নদী পাড়ে যাই। সেদিন ডুমুরিয়া থেকে নৌকাযোগে কিছু চাল আসছিলো। নদী পাড়ে এসে দেখি অসংখ্য নৌকা, প্রতিটি নৌকার ভিতরে নারী-পুরুষ, বাচ্চা, মালামাল। আমি বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করি। ওরা বললো "আমরা ভারতে যাব।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, "ভারতে যাবেন তো এই অবস্থায় এতো লোক"। উত্তরে তারা বললো যে, বটিয়াঘাটা ও দাকোপ থানা থেকে প্রচুর লোকজন আসছে। সন্ধ্যাবেলায় দেখলাম বাজার ও নদীর পাড় লোকে লোকারণ্য। কেউ রান্না করছে, কেউ বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে, কেউ বসে গল্প করছে। আমার চাল উঠানো হয়ে গেল রাত সাড়ে নয়টার দিকে। আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। রাতটা বাড়িতে কাটিয়ে ভোরবেলায় আমি আমার কাকা, দুই দাদুসহ বাজারে চলে এলাম। আমরা এসে

দেখি বাজার লোকে লোকারণ্য। আমরা বাজারে আসার পরও লোকজনের আসা অব্যাহত ছিল। এই অবস্থায় দেখলাম কিছু দালাল লোকজনকে ভারতে যাওয়ার ব্যাপারে বাস ঠিক করে দিচ্ছে। সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে বাড়ি চলে এলাম। আমাদের বাড়ির আশেপাশের অনেকেই ইতিমধ্যেই ভারত চলে গিয়েছিলো। আমরা মাত্র তিন ঘর দেশে ছিলাম। বাড়ি গিয়ে দেখলাম ফাঁকা ঘরগুলো লোকে লোকারণ্য। বাড়িতে কিছুক্ষণ থেকেই আমি আবার নদী ঘাটে চলে এলাম। একটা লোক আমার সাথে কথা বলার জন্য এগিয়ে এল। লোকটা হয়তো আমাকে চেনে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো ঠাকুরদা আমার কাছে কিছু সোনা আছে তুমি কি কিনবে? আমি বললাম, আমি সোনা কিনবো না, চাউল হলে কিনতে পারি। লোকটা তখন বলল আমার কাছে শুধু সোনাই আছে। কিন্তু পয়সার প্রয়োজন। পয়সা কোথায় পাব। আমি যখন লোকটার সাথে কথা বলছিলাম ঠিক তখনই গুলির শব্দ হলো। তখন আনুমানিক সকাল সাড়ে ৯টা। আমার মনে হলো গুলির শব্দটি বাজারের দিকে হলো। গুলির শব্দ শোনামাত্র আমি বাজারের দিকে দৌড় দিলাম। দৌড়ে আমাদের দোকানে ঢুকলাম, আমার বাবা, দাদু, কাকা সবাই তখন ঘরের দরজা লাগানোতে ব্যস্ত। আমি বললাম বাবা ব্যাপার কি? গুলির শব্দ হলো কোথায়? আমার বাবা বললেন, এটা তো মিলিটারির গুলির শব্দ, খান সেনারা এসেছে। ওরা গুলি করছে, আমাদের বাড়ি চলে যেতে হবে। বাবার কথায় আমি দোকানের পিছন দিক দিয়ে দৌড়ে বাড়ি চলে এলাম। দোকান থেকে আমাদের বাড়ির দূরত্ব এক কিলোমিটারের মতো হবে। বাড়িতে এসে দেখি সবাই ভয়ে কান্নাকাটি করছে। আমি সবাইকে কান্না থামাতে বলে আমাদের নদী ঘাটে এলাম। এসে দেখি আমাদের ঘাটে পাড়ার বিনয় কাকা একটা নৌকায় তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে বসে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাকা আপনি কোথায় যাবেন? কাকা বললেন ওপাড়ে যাবো। আমি বললাম, কাকা আপনারা একটু দাঁড়ান আমি আমার ভাইবোন, কাকা-কাকীমাদের নিয়ে আসি। আমরাও ওপাড়ে যাবো। বাড়িতে এসে আমি সবাইকে একত্রিত করে নদীঘাটে নিয়ে এলাম এবং নৌকায় চড়ে ওপাড়ে এলাম। ওপাড়ে এসে আমরা কাইয়ুম শেখের বাড়িতে উঠলাম। ওদের বাড়িতে উঠলে ওরা একটু অসন্তুষ্ট হলো, বললো তোমরা এখানে এসেছো যদি ওরা এপাড় হয়ে আসে তাহলে আমাদের অসুবিধা হবে। তখন আমি আমার ভাই-বোনদের নিয়ে গ্রামের ভিতরে চলে এলাম। আমাদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ওহাব সাহেব উনার ভাই হান্নান সরদার ওরা আমাকে দেখে বললো তোরা যখন চলে এসেছিস তখন একটু বিলের দিকে যা। এখানে থাকলে ঝামেলা হতে পারে। তাদের পরামর্শে আমরা বিলের ভিতরে চলে এলাম। বিলের ভিতরে কিছু দূর যাওয়ার পর একটা ছোট খাল ছিল ঐ খাল পেরিয়ে ছিল একটা পাট ক্ষেত। আমি পাট ক্ষেত থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম। নৌকায় করে আমরা বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। বাড়িতে পৌঁছে পা ধুতে পুকুরে গেলাম। তখন দেখলাম পুকরে দশ-পনেরো জনের লাশ ভাসছে। পুকুর থেকে বাড়িতে এলাম। যখন বাড়িতে ঢুকতে যাব তখন বাড়ির পাশের

নারিকেল গাছের নিচে দেখলাম এক তরুণের লাশ পড়ে আছে। আমরা সবাই বাড়ি ফিরে এলেও মা ও দাদু ফিরে এলো না। বাড়িতে ফেরার পথে শুনলাম দাদু গুলি খেয়ে মারা গেছেন। মা অন্যদের সাথে চলে গিয়েছিলেন। পরে বাড়ি ফিরে আসেন।

ঐ রাতটা এভাবেই কাটলো। সকালবেলা দেখলাম চারপাশে শুধু লাশ আর লাশ। এখানকার তৎকালীন মেম্বার ওহাব সাহেব ২১ তারিখ সকালবেলা চৌকিদার ওয়াজেদ আলী, শের আলী ও আরও অনেকে লাশগুলো নদীতে ফেলে দিতে বললেন। ওদের কথামতো লাশগুলো নদীতে ভাসিয়ে দিল। আমার জানামতে ঐদিন ৫/৬ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।



কমলা জোয়ার্দ্দার
পিতা : অনন্ত তরফদার
বয়স : ৫০ (আনুমানিক)
কাটিয়ানাংলা জোয়ার্দ্দার বাড়ি।

গ্রাম ছেড়ে সবাই চলে 'যাতি' লাগলো (ভারত যাবার উদ্দেশ্যে)। আমরাও স্বামী, ২টি মেয়ে, ভাসুর, দেওরসহ আরো অনেকে দুপুর ১২টার সময় রওনা দিয়ে প্রথম মহিলমারায় যাই। সেখান থেকে প্রায় ৫০/৬০ জন লোক একসঙ্গে বড় দুটো নৌকা করে চুকনগরে আসি। আমরা নৌকায় ছিলাম না, মালপাড়ার ডাঙ্গায় ছিলাম। সেখানে পাক-শাক করে খাই। তখন কেউ কেউ বলে যে তোমরা সরে যাও, আবার কেউ বলে যে চুপ করে পাক-শাক করে খাও। চেয়ারম্যান বাড়ি লুট করতেছে (দেশীয় সন্ত্রাসীরা)। তোমাদের কোন ভয় নেই। আমরা চলে যাব এইরকম অবস্থায় গুলি আরম্ভ হলো। যখন পাকিস্তানিরা আসে তখন ঐ জায়গার লোক পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে শ্লোগান দেয়। পাকিস্তানের পতাকা দিয়ে তারা প্রথম চুকনগর বাজারে আসে, পরে ভেতরে আসে ঐসব যন্ত্রপাতি হাতে করে। আমরা ছিলাম 'ডাউন' অঞ্চলে। সেই 'ডাউন' অঞ্চলে ৩ জন লোক আইসা আমাদের গুলি করলো। দুজন 'টোটা' ফুটাইলো, আর একজন গুলি করলো।

পাকিস্তানিদের আসতে দেখে আমরা আগেই মালপাড়া পুকুরের ভেতর নামিছিলাম। দুটো মেয়ে ওরা বাবার কাছে ছিল। আর আমি আমার স্বামীর হাত ধরে ডুব দেই। আমার দেবরও আমার কোলের কাছে দাঁড়ানো ছিল। আমারে বলেছে, 'বৌদি এই জাগাতে কেউ উঠিয়েন না, দেখলে গুলি কইরে দেবেনে। তা তুমি আমার পাশে দাঁড়ায় থাক।' আমি ঐ দেওরের পাশে দাঁড়ায়ে ছিলাম। তখন আমার মাথাটাকে সরায়ে দিয়ে দেবরটাকে গুলি করলো। ওরা (পাকিস্তানি) এক

গুলিতে দুই ভাইকে মেরে দেয়। বড় মেয়ের গায়ে গুলি লাগলো। গুলি করার সাথে সাথে সব ডুবে গেল। মালপাড়া পুকুরের সব জল লাল হয়ে যায়। ঐ পুকুরে '৫০-৬০ জন মারা পড়িল।' আমরা যে জায়গায় ছিলাম সেখানে হাজারখানেক লোক মারা গেছে। চুকনগর বাজারে তো লাইন দিয়ে গুলি করে মেরেছে। গোপালখালি, মুসিয়াডাঙ্গা, খাটামারি এলাকায় লোকজন মরেছে। জোয়ার্দ্দার বাড়ির 'চারি ব্যাটারে' এক গুলিতে মেরেছে।

গুলি করে ওরা চলে গেলে আমরা কান্নাকাটি করি। আমাদের জিনিসপত্র সব লোকজন নিয়ে যেতে লাগলো। আমাদের পাশে দাঁড়াবে এমন লোকজন ছিল না। আমাদের কেউ সাহায্যও করেনি। লোকজন সব ঘরে দুয়ার দিয়ে বসে ছিল। 'আমরা জল চালাম', তা জল দিল না। ঐ জাগার লোকজন আমাদের বলতে লাগলো 'তোমাদের লাশ হয় নিয়ে যাও না হয় খেয়ে যাও।' তা আমরা বললাম যে, 'দেখো আমরা দুর্দিনে পড়েছি, আমাদের তো লোকজন নেই। লাশ তো খাওয়ার জিনিস না, খাওয়ার মত জিনিস যদি হতো তাহলে কি আমরা এখানে ফেলে যেতাম? আমরা নিয়েই যেতাম। আর আমাদের লাশ যদি আমাদের দেশ অঞ্চলে মরতো তাহলে তো আমরা এই লাশের সৎকার করে যেতাম।' তো সেই 'পুকুরে ফেলানি ছিল। ঐখানকার লোকে তাগের উলঙ্গ করে কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে গেছে।' সেখানে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে একজনের স্বামীকে গুলি করে মেরেছে। তার কোলে যে শিশু ছিল তা আমাকে দিয়ে বলেছে 'দিদি তুমি এই শিশুটা নিয়ে যাও। আমি আমার সবকিছু হারায়ে ফেলেছি।' আমি বলেছি 'আমি নিয়ে কি করবো, আমিও হারিয়েছি। তোমারটা তুমি নিয়ে যাও, যদি বাঁচাতে পারো তাহলে তোমারই নাম থাকবে। আমাদের সব কিছু সে জায়গায় পড়ে থাকলো। গুলির পর আমরা তেঁতুলিয়া বাজারে এসে ওখান থেকে নৌকা ভাড়া করে সন্ধ্যার সময় মহিলমারা বাজারে এসে দুলাল ঠাকুর (ডাক্তার)কে দিয়ে মেয়েকে চিকিৎসা করাই। টাকা-পয়সা নিল না, ওষুধপাতির দাম শুধু আমরা দিলাম।

অনেক কষ্টে আমরা চলেছি। 'আগে মাইনষের বাড়ি কাজ-কাম করে খাতি পারতাম, এখন তাও পারি না।' আমার শ্বশুরের ৫টা ছেলে ছিল। ৯ বিঘা জমি ছিল। আমার স্বামী ঐ জমি-জমার কাজ করতো। খুব কষ্টে দিন যায়। এই সবকিছুরই তো বিচার চাই।



খুকু রানী জোয়ার্দ্দার
বয়স : ৫০
গ্রাম : কাটিনাঙলা
খুলনা।

তখন ১৯৭১। আশেপাশে গণ্ডগোল চলছিলো। কাটিনাঙলা গ্রাম থেকে আমরা সবাই একসাথে আমাদের গ্রামের সব লোক ভারতে যেতে ছিলাম। পথে ঐ জায়গায় (চুকনগর) আমার স্বামীকে পাকিস্তানিরা হত্যা করে। ওরা (পাক আর্মি) পায়ে হেঁটে এসেছিলো। চুকনগরের বাজারের থেকে আমরা একটু 'ডাঙ্গার' দিকে ছিলাম। সেই জায়গায় পায়ে হেঁটে এসে আমাদের সব লোক হত্যা করে। এক জায়গায় আমাদের ৯ জন লোক মরেছে। আমাদের গ্রামের জোদ্দার (জোয়ারদার) বাড়ির পাঁচজন লোক মারা গেছে। আমার স্বামী, ভাসুর, দেওর, ঠাকুর জামাই, আর এক ভাসুরকে গুলি মারে। সৈন্যরা আসছিল ৪ জন। আর ঐ জায়গায় বিভিন্ন এলাকার লোক ছিল। চুকনগর গ্রামেরও লোক ছিল। আমাদের গ্রামের যত লোক সব একসাথে এক জায়গায় ছিলাম। পুরুষ লোক, যুবকদের বেশি মেরেছে। মহিলা, বাচ্চাদের কিছু বলেনি। গুলির পর আমরা সব ঐ জায়গা থেকে চলে যাই কেউ ভারতে, আবার কেউ কেউ কাটিনাঙলাতে ফিরে যায়। আমার শাশুড়ি, ছেলেমেয়ে নিয়ে পরে ঐ জায়গায় থেকে দেশে ফিরে আসি।

ঐ ঘটনার পর ফিরে এসে যে রাজা ছিল তার কাছে আমরা এ জন্য অনেক দরখাস্ত করেছি। অনেক হাঁটাপিটা করেছি। বিচার চেয়ে আর কি করবো? 'তানা'দের তো ফিরে পাব না। বিচার, এই যারাই রাজা আছেন তারাই করবে বিচার।



নির্মল কুমার রায়
পিতা : ঈশ্বর শিবগত রায়
বয়স : ৪৮
পেশা : কৃষি
গ্রাম : আলাদিপুর
থানা : চুকনগর।

'৭১ সালে আমি সবেমাত্র ফাইভ থেকে সিক্সে উঠেছি। তখন দেশে আন্দোলন শুরু হলো। পরে যুদ্ধ শুরু হলে আমরা মঙ্গলবার, ৩ জ্যৈষ্ঠ সকালে আমাদের বাড়ি থেকে বের হই ভারতে যাওয়ার

জন্য। আমাদের বাড়ি চুকনগর থেকে ১৫ মাইল দূরে। বুধবারে আমরা চুকনগরে এসে পৌছলাম।

বৃহস্পতিবার ৫ জ্যৈষ্ঠ সকালবেলা আনুমানিক সকাল ৮টায় বাবা আমাকে বটগাছের গোড়ায় দাঁড় করিয়ে, আমার ভাইয়ার খুলনা থেকে আসার কথা, তাকে খুঁজতে গেলেন। বটগাছের গোড়ায় একটি কল ছিল, আমি সেই টিউবওয়েলে জল খেতে গেলাম। আমি যখন জল খাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম রাস্তার দুই ধার দিয়ে দুটো গাড়ি এসে থামলো এবং গাড়ি দুটো থেকে খান সেনারা নামলো। গাড়ি দুটো থেকে কত জন খান সেনা নেমেছে বলতে পারবো না। গাড়ি থেকে নেমেই তারা গুলী করতে শুরু করলো। আমি যখন জল খাচ্ছিলাম তখন একটা কিছু আমার সামনে এসে পড়লো, আমি মনে করলাম কি জিনিস এইটা তুলে দেখি নোড়ার মতন গুলীটা। গুলীটা তুলে আমি দৌড় দেই মুচি বাড়ির দিকে। মুচি বাড়িতে এসে দেখি ঐ বাড়ির সবাই বারান্দায় মরে পড়ে আছে। তখন ভয়ে এবং জীবন বাঁচাতে আমি একটা পুকুরের ভিতর আশ্রয় নিলাম। আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অবস্থা কি এবং তারা কে কোথায় তখনও আমি কিছুই জানি না। পরে পাক আর্মি চলে যাবার পর পুকুর থেকে বের হয়ে দেখি সমস্ত বাজার জুড়ে শুধু মৃতদেহ আর মৃতদেহ। আমার মতে এখানে প্রায় এক লাখ মারা যায়। বিকেল বেলা আমি ঘটনাস্থলে পৌছে দেখি আমার বাবা, চাচারা পাঁচজন মরে পড়ে আছেন। আমার দুই জেঠিমার গায়ে গুলি লাগে। তারা বেঁচে যান। আমি তাদের খুঁজে বের করে নিয়ে যাই।

চুকনগর গণহত্যায় স্থানীয় যারা সহযোগিতা করেছিলো তাদের অন্যতম হলেন চুকনগরের স্থানীয় চেয়ারম্যান গোলাম হোসেন। ইনি খানদের এখানে নিয়ে আসেন। আমার বাবা এখান দিয়ে (চুকনগর) সব সময় আসা-যাওয়া করতো। এখান থেকে লোক পার করতো ভারতে। আমার বাবা লোক 'আনি দিলে ইনি (গোলাম হোসেন) পার করতেন।' আমার বাবাকে উনি বললেন, "তোমাদের এলাকায় যত লোক আছে এই এলাকায় নিয়ে আস, কোন অসুবিধা হবে না, ভারতে পারে করে দিব নে।" তার কথায় আমরা সবাই চলে এসেছিলাম, এর ভিতর গোলাম হোসেন যশোরে ফোন করে ঐ লোকদের নিয়ে আসে।

আমার বাবা চাচারা মারা যায়। আমি আমার দুই জেঠিমাকে নিয়ে বাড়ি চলে আসি। তারপরের দিন আমার মা ৪ ভাই ও ৩ বোনকে নিয়ে বাড়ি আসে। মায়ের কাছে জানতে পার গুলী শুরু হলে আমার মা ভাই-বোনদের নিয়ে ওপারে চলে যায়। ওপারে একটি স্কুলে ওরা না খেয়ে ছিল। পরে নৌকায় করে বাড়ি ফিরে আসে।

স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের সরকার আমাদের নিহত পরিবারগুলোকে ২ হাজার করে টাকা দিয়েছিলো। আমরা যে টাকা পেয়েছিলাম সে টাকা দিয়ে টিনের ঘর তৈরি করি। এরপর আর কেউ কোন সাহায্য সহযোগিতা করে নি। আমরা চুকনগর হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।



সরস্বতী মণ্ডল
স্বামী : কৃষ্ণ দাশ মণ্ডল
বয়স : ৪৮
পেশা : গৃহিণী
গ্রাম : কাতিনাঙলা
থানা : বটিয়াঘাটা।

মুক্তিযুদ্ধের সময়, বৈশাখ মাসের শেষ দিকে গ্রামে লুটপাট-অত্যাচারে অস্থির অবস্থা। জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। পরিবারের সবাই ভারত যাব বলে নৌকায় চুকনগরের পথে রওনা হলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে চুকনগরে এলাম। তারিখ স্পষ্ট মনে নেই। বেলা ১১টার দিকে দালালেরা আমাদের চুকনগরে নামিয়ে দিল। বললো কলারোয়া, ঝাউডাঙ্গায় পাকবাহিনী গোলাগুলি করছে আমরা যেন এখানে বেশি দেরি না করি। চিড়া-মুড়ি কিছু একটা মুখে দিয়েই যেন ওপারে চলে যাই।

কিছু মুখে দেবার সুযোগ আর পেলাম না, হঠাৎ শুনলাম পাকবাহিনী গুলী করছে। স্বামী-সন্তানসহ কাছের একটি পুকুরে আত্মগোপন করে রইলাম। আমার স্বামীকে শাড়ির আঁচলে লুকিয়ে রাখলাম। পাকবাহিনী বন্দুকের নল দিয়ে, মাথার কাপড় সরিয়ে গুলী করে। চুকনগরের গোলাগুলি এবং স্বামীর মৃতুর পর সেদিন আর ভারতে যাওয়া হয়নি। আবার গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেলাম। ১৫/১৬ দিন পরে ভারতে যাই। দেশ স্বাধীন হবার পর ফিরে আসি।



আতিয়ার রহমান
পিতা : মৃত আব্দুল হাকিম মোড়ল
বয়স : ৪৮
পেশা : চাকরি
গ্রাম : বুকুদিয়া
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে আমি মধ্যগ্রাম কলেজের ছাত্র ছিলাম। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আমার ভাইপো আবুল হোসেনকে নিয়ে রংপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য ঘুরে বেড়াই। রংপুরে আমি শুনতে পাই চুকনগর ছেড়ে বহু লোক চলে যাচ্ছে। চুকনগর গণহত্যার দিন ২০মে সকালে আমি আমার ভাইপো আবুল হোসেনসহ চুকনগরে এসে পৌছি। তখন সকাল আনুমানিক ৮টা। আমরা দুজন চুকনগর বাজারের পেছনের নদীতে গিয়ে দেখি সেখানে প্রচুর নৌকা এবং শরণার্থী। হঠাৎ আমরা দেখি

একটা নৌকায় বসে কিছু লোক ভাত খাচ্ছে। আর কয়েকটা ছেলে তাদের ভাত খেতে নিষেধ করছে এবং বলছে যে, "তোমরা নৌকার থেকে উঠে ভাত খাও। আমরা নৌকা নিয়ে যাব।" যারা ভাত খাচ্ছিলো তারা খুব কাকুতি মিনতি করছে যে, "আমরা ভাত কয়টা খেয়ে নি। তারপরে নৌকাটা নিয়ে যেও।" কিন্তু ওরা টাইম দিতে নারাজ। তখন আমরা দুজনে প্রতিবাদ করে বলি যে, "যার নৌকা সেই বসে ভাত খাচ্ছে, তোমরা কেন নৌকাটা নিয়ে যেতে চাচ্ছ?" ওরা তখন আমাদের সাথে ভীষণ তর্কাতর্কি শুরু করে দেয়। নৌকায় বসে যারা ভাত খাচ্ছিলো তারা ভাত থেকে থাকে। আমরা ও ওরা দাঁড়িয়ে থাকি। ভাত খাওয়া হলে নৌকার মালিকেরা নৌকা থেকে নেমে ওদের হাতে (যারা এতক্ষণ নৌকা থেকে নেমে যাওয়ার জন্য বলছিলো) দড়ি নিয়ে চলে যায়। কিন্তু ওরা তখন আর নৌকা নিতে রাজি হয় না। এই অবস্থায় ওরা (যারা আমাদের সাথে তর্ক করেছিলো) নৌকার দড়িটা আমাদের হাতে দিয়ে বলে, "আপনারা যারে খুশি তারে দেন।" তখন আমরা নৌকার ওপরে যেয়ে বসলাম। নৌকার ওপরে যেয়ে বসার পরই ওরা "নৌকা ছেইরে চইলে গেল, আর ঠিক তখনই মিলিটারিরা গুলী করতে করতে বাজারের ভিতরে ঢুকিছে।"

নৌকার ওপরে থাকা অবস্থায়ই বর্ষার মত গুলীর শব্দ শুনছি। বৈঠা নিয়ে আসার সময় পাইনে। নৌকার মধ্যে শুয়ে দুজনে হাত দিয়ে নৌকা বাইছি। তখন চারদিকে শুধু কান্নার রোল। আমরা দেখি যে কিছু কিছু লাশ নদীতেও পড়ে গেছে এবং কিছু কিছু লোক, ছেলেমেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। অনেক বাচ্চাও এইভাবে নদীতে পড়ে মারা গেছে। আমরা নদীর থেকে আর উঠিনি। এইভাবেই নদী থেকে সোজা ভাটায় চলে এসেছি।

আবার দুটার দিকে মিলিটারিরা চলে যাওয়ার পর আমরা ফিরে এলাম। ফিরে এসে দেখলাম শুধু লাশ আর লাশ। সেদিন কম করে হলেও দশ হাজার নিরীহ লোককে হত্যা করা হয়। যারা নিহত হয় তাদের অধিকাংশ ছিল অস্থানীয়। খুলনার বিভিন্ন নিচু অঞ্চলের লোকজন এরা জীবন বাঁচাতে ভারতে যাওয়ার জন্য চুকনগরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। চুকনগর বাজার, চুকনগর কলেজের আশেপাশে এবং নদীতে বহু লাশ আমরা নিজের চোখে দেখেছি। সমস্ত চুকনগর সেদিন ছিল শুধু লাশ আর লাশ।

আমি চুকনগর হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। সরকার যদি হত্যাকারীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করে তবে, আমি সেখানে গিয়ে সাক্ষী দেব। আমি শুধু চুকনগর হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই না। আমি আমার বন্ধু আবুল হোসেন মোল্লার হত্যাকারী রাজাকারদের বিচার চাই। আমার বন্ধু আবুল হোসেন মোল্লা (গ্রাম : নোয়াকাঠি, থানা : ডুমুরিয়া, জেলা : খুলনা) ওকে বাইরে খালি খেয়াঘাটে রাজাকার কমান্ডার মনি রাজাকারের নির্দেশে শামসুর রহমান রাজাকার (গ্রাম : টিটনা, থানা : ডুমুরিয়া, জেলা : খুলনা) গুলী করে মেরেছিলো। আমি আমার বন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।



ব্রজবাসী গাইন
পিতা : রামমিস্ত্রী
স্বামী : বিনয় কৃষ্ণ গাইন
বয়স : ৪৮
পেশা : গৃহিণী
বটিয়াঘাটা।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাজাকার-আলবদরদের নানা রকম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ভারতে যাবার উদ্দেশ্যে চুকনগরে এসে উপস্থিত হই নৌকায় করে। বেলা ১০টা কি ১১টার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এসে হাজির হয়। ৪/৫ জন পাক সৈন্য এলোপাতাড়ি গুলি করতে শুরু করে। সেদিন বহু লোককে হত্যা করে। গোলাগুলির সময় আমার স্বামী, শ্বশুরসহ দুই দাদা শ্বশুর, দাদা শ্বশুরের এক ছেলে মারা যায়। এরপর কোনরকমে জীবন নিয়ে ভারতে চলে যাই। দেশ স্বাধীন হবার পর ফিরে আসি। আমার স্বামী, শ্বশুরের হত্যাকারীদের বিচার চাই।



আশুতোষ নন্দী
পিতা : দুর্গাপদ নন্দী
বয়স : ৪৮
পেশা : শিক্ষকতা
গ্রাম : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

'৭১ সালে চুকনগর গণহত্যা সংগঠিত হয় বাংলা জ্যৈষ্ঠ মাসের ৫ তারিখ বৃহস্পতিবার। বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত শরণার্থী এখানে জমায়েত হয়েছিলো। উদ্দেশ্য ভারতে যাওয়া। এখান থেকে বাস এবং ট্রাকযোগে সাতক্ষীরার ভেতর দিয়ে কলারোয়া, শেওড়া হয়ে ইন্ডিয়া যাওয়া সহজ ছিল। কিন্তু ট্রাক এবং বাস সংখ্যায় এত কম ছিল যে, স্বল্প সময়ে এত লোক বহন করে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন ছিল। এখানে আগত লোকজন সবাই কিছুটা রেস্ট (বিশ্রাম) এবং রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করা শুরু করেছিলো। এ কারণে যে পর্যায়ক্রমে যেতে পারবো। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে উপস্থিত ছিল। এই লোকগুলো যখন আনুমানিক সকাল সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার ভেতরে তাদের মতো করে রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া শুরু করেছিলো, এই সময় বর্তমান যে কলেজ এই কলেজের দক্ষিণ পার্শ্বে আমাদের বাড়ির সীমানার শেষে গাড়ি থামলো। সেখান থেকে নির্বিচারে ওরা (আর্মি) গুলি চালানো শুরু

করে। এই কলেজের সামনে যে মাঠ এটাকে বলা হয় পাটকোলার বিট। এখানে অগণিত লোক মারা যায়। কিছুটা ভেতরে ঢোকার পর খান মিলিটারিরা জানতে পারে এখানে একটা মুসলিম পাড়া আছে। তখন ওখানে একটা ফাঁকা আওয়াজ করে এবং একটা বাচ্চা মারা যায়। তারপর ওরা ঢুকলো বাজারের ভেতরে। সেখান থেকে ইমান আলী শেখ নামে একজনকে সাথে নিল। সেই ব্যক্তিকে আমাদের ঘরে আগুন দেয়ার কথা বললো। আমরা তখন পাড়া থেকে একটু দূরে সরে যেয়ে অবস্থান করছি। গুলির শব্দ পাওয়ার পর পরই আমরা একটু সরে গেলাম। দূর থেকে আমরা মোটামুটি দেখতে পারছিলাম যে মিলিটারিরা কি করছে। ইমান আলী শেখ আমাদের ঘরে আগুন দিতে রাজি না হওয়ায় খান মিলিটারিরা তাকে যথেষ্ট আঘাত করলো। তারপর সেই ইমান আলী শেখ আমাদের বাড়ি এবং পাশে আমার দুই মামার বাড়িতে আগুন দিতে বাধ্য হলো। সেই আগুনে আমাদের এবং মামাদের বাড়ি পুড়ে গেল। আমাদের এখান থেকে রায়পাড়া, মালুপাড়ার ভিতর দিয়ে নদীর চরে যায়। নদীর চরে অগণিত লোক ছিল। সেখানে গুলি চালিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ লোক মারা হয়। শিশুসহ ডুবে অনেকেও মারা যায়। আমরা তা দেখেছি। আমরা এই সময় মিলিটারিদের গতিধারার সাথে তাল রেখে দূরে দূরে থাকতে লাগলাম। আমরা বাঁচবো, যেহেতু আমরা স্থানীয় ব্যক্তি। এরা কোন পথে দিয়ে আসছে এবং কোন পথ দিয়ে গেলে বাঁচবে এটা আমরা বুঝি। সে হিসাবে এরা যখন নদীর চরে আসে আমরা তখন নদী পার হয়ে বোরিগোলা ইউনিয়নের ভেতরে ঢুকে গেলাম। এরা নদীর পাড়ে যত লোক ছিল সব মারতে মারতে চুকনগরের ভেতরে প্রবেশ করে। কিছু লোক বাজারের ভেতরে একটা বড় কালী মন্দিরের লাগোয়া একটা গাছের গোড়ায় লুকিয়ে ছিল। তারা ভেবেছিল যেহেতু গুলি দক্ষিণ দিক থেকে আসছে উত্তর দিকে গাছের গোড়ায় লুকিয়ে থাকলে তারা বাঁচবে। কিন্তু মিলিটারিরা নদী পার হয়ে পিছন দিক দিয়ে ঢুকলে গাছের গোড়ায় যারা পালানো ছিল তাদেরকে গুলি করলো। মন্দিরের আশেপাশের দোকানেও পর্যাপ্ত লোক ছিল তাদেরকেও মারলো।

মানুষ যেহেতু দূর-দূরান্ত থেকে আগত, কোন দিকে গেলে বাঁচবে এটা তাদের সঠিক জানা ছিল না। কেউ বিভিন্ন গাছে, নদীর আড়ালে, চরে, পুকুরের ভিতরে এমনি অবস্থায় জীবন বাঁচানোর দায়ে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। কে বা কারা এদেরকে খবর দিয়ে আনলো এটা কিন্তু আমরা আজও জানি না। বিকাল চারটে পর্যন্ত তারা এভাবে গুলি করেছিলো। খান মিলিটারিরা যখন চুকনগর বাজার ছাড়লো তখন স্থানীয় লোকদের বলে গেল যে এই লাশ যদি তোমরা এক্ষুণি না ফেলে দেও তাহলে কালকে এসে আবার তোমাদের ক্ষতি করব। এই ভয়টা দেখালো যারা নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবার বলেছিলো স্থানীয় কিছু মুসলমান এবং যাদেরকে বুঝেছিলো মোটামুটি পাকিস্তানপন্থী লোক। যেহেতু আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক সেহেতু পাক মিলিটারিরা আসার আগে আমরা কিছুটা ভয়ে ভয়ে থাকতাম। কারণ কখন আসে, কি ক্ষতি হয়, আগুন দেয়, কি গুলি করে মারে, এই অবস্থায় আমরা ছিলাম। মিলিটারি যখন আসে তখন আমি আমার বড়

বোন, ভাইয়ের স্ত্রী এবং ফ্যামিলির আরো কিছু লোকজনকে বাসে তুলে দেবার জন্য চুকনগরে বাদামতলার মোড়ে বাসস্ট্যান্ডে ছিলাম। মিলিটারি যখন গুলি করা শুরু করে আমরা সেই গুলির শব্দে বাড়িঘর ছেড়ে আরও একটু দূরে সরে গিয়েছিলাম। যে কারণে আগুন দেয়ার সময় আমাদের বাড়ির কাউকে সেখানে পায়নি। ওরা এমনভাবে গুলি করেছে যে, যে অবস্থায় ছিল, সে সে অবস্থায় মারা গেছে। যে হারে লাশ ডিঙ্গায় নদী পার করেছি তাতে আমার যতদূর ধারণা আট থেকে দশ হাজার লোক এখানে মারা গেছে। স্থানীয় দশ থেকে পনেরো জন লোক মারা যায়। আমার দুই মামা এবং আমাদের বাড়ি বাদে আর কোথায়ও আগুন দেয়া হয়নি।

আমার জানামতে কেউ ক্ষতিপূরণ পেয়েছে বলে মনে হয় না। যারা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী তাদের বিচার হোক এটা আমি চাই।



শেখ আবুল কালাম মহিউদ্দীন
পিতা : মৃত শেখ কেরামত আলী
বয়স : ৪৮
পেশা : ব্যবসা
গ্রাম ও ডাকঘর : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

হত্যাকাণ্ডটি আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কারণ আমার বাড়ি চুকনগর। সে সময় ('৭১ সাল) আমি ছাত্র। কেশবপুর কলেজের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছিল ইংরেজি ২০মে, বাংলাতে ৫ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

গণহত্যার আগে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে ছিল। কারণ ২৫শে মার্চ রাতে বর্বর খান সেনারা ঢাকা ভার্সিটিতে যে গণহত্যা চালায় তারই ধারাবাহিকতায় খুলনা তথা আমাদের এই আশপাশে এলাকায় দক্ষিণ অঞ্চলেও অব্যাহত রাখে। আতঙ্কিত লোকজন জান বাঁচানোর জন্যে গ্রাম, বাড়িঘর ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য প্রতিদিন এ এলাকা দিয়ে চলে যেতো। চুকনগরকে এরা ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করতো। নৌকাযোগে, পদব্রজে, গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়িতে করে এরা এখানে (চুকনগরে) জমায়েত হতো। সেদিন বৃহস্পতিবার ভারতে যাবে এরকম প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ এখানে ঘটে। সকাল আনুমানিক দশটা এগারোটার সময় রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া শেষে হঠাৎ করেই পাক সেনারা এই সমস্ত সাধারণ লোকের ওপর আক্রমণ চালায়। গ্রামের পশ্চিম দিকে অর্থাৎ সাতক্ষীরা রোড দিয়ে ২টি আর্মি পিকআপ ভ্যানে করে আনুমানিক ২০/২৫ জনের মত ওরা (পাক আর্মি) আসে। এখান থেকে ওরা প্রথমে এ্যাটাক করে এবং

কয়েকটা গ্রুপে ভাগ হয়ে যায়। একেক গ্রুপে ৩ জন, ৪ জন, ৫ জন এভাবে ভাগ হয়ে একেক সাইড দিয়ে গ্রামে ঢুকে যায়। ওরা প্রথমে মালতিয়া যেখানে চুকনগর কলেজের দক্ষিণ দিক, এখান এখানে সবুজ ধানের ক্ষেত, কিন্তু ঐ সময় এখানে জোয়ার-ভাটায় পানি আসা-যাওয়া করতো। কারণ নদী ছিল তখন ছাড়া। নদীতে কোন বাঁধ নেই। জীবন বাঁচানোর জন্য এ নদী দিয়েই লোকজন সব ভারতে যাচ্ছিলো। এরা এই নদী দিয়েও এখানে আসে। আবার বাজারের পাশ দ্বিয়ে যে ভদ্রা নদী, ঐ নদী দিয়েও এসেছিল। নদীতে আনুমানিক ২০০-২৫০ নৌকা ছিল। পাক সেনারা এদের উপর আগে আক্রমণ চালায়। আর এদের আক্রমণ করতে এসে পাশে জমিতে পাট ক্ষেতে কাজ করছিলো মালতিয়া গ্রামের চিকন মোড়ল। তাকেই প্রথম গুলি করে মারে। ঘাসের আঁটি নিয়ে আসছিলো বিল থেকে সুরন কুণ্ড নামে এক লোক। তাকেও ওরা গুলি করে মারে। পরবর্তীতে জমির পাশে যে মাঠ, মানে পাত ভোলার বিল এখানে যারা নৌকায় এসেছিলো এদের গুলি করে মারে। মারার পর বাজারের ভিতরে যে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ঘটেছিলো তারা তখন ভয়ে আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। কে কোথায় যাবে কোথায় পালাবে। এদেরকে মেরে ওরা চুকনগর পুটিমারি অর্থাৎ ঋষিপাড়া হয়ে এখানকার ৩ জনকে মারে। আমাদের স্থানীয় ১০-১২ জন লোক মারা যায়। বাকি সবাই বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া ও অন্যান্য এলাকার। এরা আর্মস ব্যবহার করেছিলো চাইনিজ রাইফেল, টমিগান সম্ভবত এল.এম.জি এ ধরনের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এদের কাছে ছিল। আমার ধারণা গুলি এবং ভয়ে নদী পার হয়ে পালাতে যেয়ে মারা গেছে বিশেষ করে মহিলা এবং শিশু মিলে আনুমানিক ৮-৯ হাজার হবে। প্রাপ্তবয়স্ক যুবকরাই বেশি মারা গেছে। হত্যাকারীরা ৩টা সাড়ে ৩টার দিকে ফিরে যায়। যাবার সময় সাইকেল, শরণার্থীদের কিছু জিনিসপত্র লুটপাট করে এবং আমাদের বাড়ি থেকে জাপানি একটা রেডিও ট্রানজিস্টার নিয়ে যায়। যে গ্রুপটি আমাদের বাড়ি গিয়েছিলো তারা আমাদের লাইন দিতে বলে জিজ্ঞাস করে আমরা মুসলমান কি না। হিন্দু বাড়ি কোন দিকে। আমরা জীবন বাঁচানোর জন্য ঐ সময় কলেমা পড়েছিলাম এবং পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়ে ওদের হাত থেকে বাঁচার অভিনয় করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম আমরা সবাই মুসলমান। তবে হ্যাঁ আমাদের ঘরে একটা লোক মারা যায় হবিজন নামে। সম্পর্কে আমার চাচাতো বোন। পাশের বাড়ি থেকে এসে পালায়ে ছিল আমাদের ঘরে। পাক আর্মিরা যখন আমাদের উঠানে দাঁড়িয়ে আমাদের লাইন দিল এবং আমরা জিন্দাবাদ দিলে আমাদের ছেড়ে দেয় তখন সে জানালা খুলে দেখেছিলো ওরা চলে গেছে কিনা। জানালা খোলার সময় একটু শব্দ হয়েছিলো। ঐ শব্দ শুনেই শব্দ বরাবর পাক আর্মিরা গুলি করলে সেখানে ও মারা যায়। পরবর্তীতে শুনেছি যে যশোর লাইনে ভারতে যাবার জন্যে যে গাড়ি চলতো সে গাড়ির এক ড্রাইভার ছিল বিহারী। ভাড়া নিয়ে বিহারী ড্রাইভারের সাথে যাত্রীদের গোলযোগ হলে সে নাকি পরবর্তীতে আর্মিদের কাছে খবর দেয়, ফলে আর্মি এখানে আসে।

মৃত লাশগুলোর অধিকাংশই আমরা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। আর

এখানকার যে সমস্ত মুসলমানেরা ছিল তাদের কবর দেয়া হয়েছে। জোয়ার ভাটায় অনেক লাশই ভেসে গিয়েছিলো। কিছু লাশ ঝোপঝাড়ে আটকে ছিল। দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে টের পেয়ে সেগুলোকে এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে একটা গণকবর দেয়া হয়। মাটিচাপা আর কি। ১০-১১ জনের লাশ হবে। যা চুকনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে পূর্বদিকে যেয়ে ডানে পড়ে। জায়গাটা লো-ল্যান্ড ছিলো। পরবর্তীতে জমির মালিকরা মাটি ভরাট করে উঁচু করে। জায়গাটা ঐভাবে পড়ে আছে। সেখানে নেই কোন স্মৃতি চিহ্ন, কোন নিদর্শন।



মোঃ নিসার আলী সরদার
পিতা : মোঃ এবাদ আলী সরদার
বয়স : ৪৮/৪৯
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

সাতক্ষীরা থেকে আর্মিরা এসে গুলি করতে করতে এই লাইন দিয়ে উত্তরে মাঠে যায়। সেখান থেকে বাজারের ভিতরে গুলি করে। বাজারের ভিতর দিয়েই আমাদের বাড়ির সাইডে যেয়ে গুলি করে ফিরে আসে। আমরা তাই দেখলাম। ভয়েতে তখন তো 'হুরুস্থুল' হয়ে আছি। যখন গুলি করে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে মেয়েছেলে পুরুষ ছেলে এখানে-সেখানে দৌড়াদৌড়ি 'গুতাগুতি' করতে লাগলো। কেউ নদী পার হয়ে চলে গেল। সন্ধ্যার পর কেউ কেউ বাড়ি ফিরে আসে, কেউ আসে না। কেউ রাতেই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

জনার্দন ঠাকুর এখানে ব্যবসা করতেন। বাড়ি ছিলো বিহার উড়িষ্যা। আমাদের খুব 'ভক্তি' করতেন এবং আমাদের নিয়ে চলতেন। যখন হত্যা করতে গুলি চালাতে লাগলো তখন তিনি আমাদের নিয়ে শ্লোগান দিতে লাগলেন। শ্লোগান দিলাম পাকিস্তান জিন্দাবাদ। শ্লোগান দিলে ওরা (আর্মি) আমাদের আর কিছু বললো না। আমরা ওদের ভিতরে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছিলাম। ২-২:৩০ দিকে রতনকে বললো "তোমার নাম কি? স্যার, আমার নাম রতন। তারপর কইলো 'তুমি হিন্দু না মুসলমান' অয়ে বললো, 'আমি মুসলিম'। না, রতন নাম তো মুসলমানের ভিতরে হয় না, তাহলে তোমার কাপড় খোল। কাপড় খুলে তা দেখাইতে হইলো। কাপড় খুলে দেখাইলে তারপরে উনার (রতনের) বাড়ি বইসে ২-৩টা ডাব এবং পানি খাইলো।" ডাবগাছ থেকে পেড়ে দেয়া হয়েছিলো। ঐ বাড়িতে দশ-পনেরো মিনিট থেকে "মেশিনগান না কি কয়, স্ট্যানগান না জানি কি গান চালিয়ে ফড়ফড়, করকর, পটাশ-পটাশ করতে করতে চইলে যায়।"

এই জায়গায় (চুকনগর) এক খান সাহেব ছিলেন খেয়াঘাট দেখার জন্য। সে হুমকি দিচ্ছিল 'তোরা যদি এই লাশগুলি কালকের মধ্যে ফেলে না দিস তাহলে কিন্তু অসুবিধা হবে।' শুক্রবার দিন বেলা ৭-৮টার দিকে ইউনিয়নের মেম্বার, দফাদার ও

কয়েকজন ভালো ভালো লোক ডেকে বললো, 'তোমরা যদি এখানে বসবাস করতে চাও, তাহলে লাশগুলো ফেলানির ব্যবস্থা কর।' আমরা চিন্তা করলাম এখানে বসবাস করতে গেলে লাশগুলি যদি না ফেলাই তাহলে দুর্গন্ধ যাবে আমাদের নাকের ভিতরে। আবার অন্যদিকে খান সাহেবও হুমকি দিয়েছে, দেরি না হয়ে যায়। আমরা ঐ বেলা ১০-১১টার দিকে লাশ ফেলাতে আরম্ভ করি। আমার বাড়ি থেকে বাজার পর্যন্ত ৩-৪ হাজারের মত লাশ পড়েছিলো। আমি এবং আমার পাড়াপড়শি মামাতো ভাই দুজনে মিলে শ'-দেড়েকের মতো লাশ নদীতে ফেলাই। লাশগুলি পড়েছিলো নদীর উপরে, ডাঙ্গায়, বাগানের ভেতর। সেখান থেকে নিয়ে এসে সব ঐ নদীতে ফেলাই। বাড়িতে এসে গোসল করার পর মনটা খুব ভয় ভয় 'কইরতে' লাগলো।



অভিমন্যু রায়
পিতা : মৃত মন্মথ রায়
বয়স : ৪৭
পেশা : কৃষি
গ্রাম : শিবনগর
ডাকঘর : শিবনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে আমি স্কুলের ছাত্র। তারিখটা ২০শে মে, ৫ জ্যৈষ্ঠ। ভোর রাতে বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়ে পুকুমরা বিলে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িতে করে কুড়িজন পাকসেনা এখানে এসে পৌছায়। তখন আমাদের প্রায় চার/পাঁচটি 'ফ্যামিলি' নৌকায় বসা ছিলো। এই অবস্থায় গুলি করা শুরু করলে সেখানে বয়স্ক যারা ছিলেন তারা হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে পিছু হটতে থাকেন। আমার ভাই দুটো নদী পার হয়ে ওপারে চলে যায়। মা এবং বোন নৌকার নিচে লুকোন। সে সময় একটি গুলি এসে নৌকা ভেদ করে বোনের গায়ে লাগে। সে মারা যায়। এলোপাতারি গুলিতে আমার বাবা, ভগ্নিপতি মারা যান। আমার গায়ে গুলি লাগে। "যাদের শিশু ছিলো কোলে, তার মা মারা গিয়েছিলো। মারা যাওয়ার পরে ঐ শিশু অনেক পরেও তার মরা মায়ের দুধ পান করেছিলো।"

চুকনগর গণহত্যার ওপর কোন সরকার আলোচনা করেনি। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা দায়ী আমরা তার বিচার অবশ্যই চাই।



কমল কান্তি বিশ্বাস
পিতা : ঈশ্বর শ্রী বাবুরাম বিশ্বাস
বয়স : ৪৫/৪৬
পেশা : ইলেকট্রিক মেকানিক
গ্রাম ও ডাকঘর : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে আমি চুকনগর দিব্যপল্লী হাইস্কুলের ক্লাশ সিক্সের ছাত্র ছিলাম। আমার বাবার টর্চলাইট, চশমা মেরামত ও বিক্রির দোকান ছিলো। সেদিন ছিলো জ্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচ তারিখ, বৃহস্পতিবার। ছোটবেলা থেকেই আমি স্কুল শেষে বাবার দোকানে বসতাম। বাবা আমাকে দোকানে বসিয়ে খেতে যেতেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হলে পাক আর্মি যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসে সাতক্ষীরায় একটি ঘাঁটি করলো। যশোর থেকে সাতক্ষীরা যাওয়ার এটাই একমাত্র রাস্তা ছিল। ফলে মাঝে মধ্যে তারা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতো। মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে ওটা-ওটা কেনাকাটা করতো। দু-একজন লোকের সাথে কথাবার্তা বলতো। ঘটনার দু'দিন আগে থেকে বাগেরহাট, রামপাল, বটিয়াঘাটা এলাকা থেকে হাজার হাজার লোক নৌকা করে আমাদের চুকনগরে আসতে থাকে। ঘটনার আগের দিন সবচেয়ে বেশি লোক এলো। রাত্রিবেলা চুকনগর বাজার লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সকালবেলা ভিড় চরম আকার ধারণ করলো যে, আমরা তাদের আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দিতে বাধ্য হলাম।

ঘটনার দিনের সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠে যখন পুকুরে স্নান করতে যাই তখন দেখি চারিদিকে শুধু নৌকা আর নৌকা। স্নান শেষে আমি বাড়ি আসলে বাবা বললো, "বাজারে গিয়ে তুই দোকান খোল। আমি আসছি।" বাজারে এসে আমি দোকান খুলে বসলাম। কিন্তু শরণার্থী ছাড়া কোন লোকজন দেখলাম না। বেলা ৯টা-১০টার দিকে বাবা দোকানে আসলেন। বাবা এসে বললেন, "তুই তালি এখন বাড়ি যা, বাড়ি যেয়ে দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে আইসলে আমি বাড়ি যাবানে।" আমি দোকান থেকে বেড়িয়ে তাঁতিপাড়ার ভেতর যখন ঢুকলাম তখনই গুলির শব্দ শোনলাম। আমার মনে হলো গুলির শব্দ পূর্বদিক থেকে আসছে। আমি একটু ব্যস্তমত বাড়ি চলে গেলাম। বাড়ি যাওয়ার পর আমার জেঠাতো দাদা নিরাপদ আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, "কমল তুই কোথা থেকে আসলি?" আমি বললাম, "দোকান থেকে আসছি।" সে আবারও জিজ্ঞাসা করলো, "বাজারে নাকি গুলিগোলা হচ্ছে।" আমি বললাম, "দাদা, তা তো সঠিক আমি বলতে পারবো না।" এর ভিতর দেখি লোকজন ছুটাছুটি করছে। গুলির মধ্যে আমি বাজারের দিকে দৌড় দিলাম। বাজার পর্যন্ত আমি পৌছতে পারিনি। আমাদের বাজারের সাইডে কোল্ড স্টোরেজের পেছনে একটি বাড়িতে এসে পৌছলাম। আমি বাঁশঝাড়ের পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় বাঁশে একটি গুলি লাগলো। আমার সাথে আরও কয়েকজন লোক ছিল যেমন নুরু

সর্দার, রতন বেহারা। ওরা বললো, "এখানে দাঁড়াইসনে, শিগগির চল আমরা এখান থেকে পালাই।" ওখান থেকে আমি সোজা নদীর তীরে চলে এলাম। তখন আমার পরনে ছিল একটা শার্ট, পায়জামা। এই পড়েই আমি ঝাঁপ দিলাম। ওখান থেকে উঠে আমি সোজা পূর্বদিকে দৌড় দিলাম। দৌড়িয়ে আমি সোজা চলে গেলাম গৌরীঘোনা। গৌরীঘোনা খেয়া পাড় হয়ে আমি যশোর জেলায় চলে এলাম। গোবিন্দকাঠিতে এসে আমি আমার ছোট দুই ভাইকে পেলাম। বিকেল পাঁচটার দিকে আমরা আবার বাড়ি ফিরে এলাম।

নদী পার হয়ে এই পাড়ে এসে দেখলাম প্রচুর লাশ ফালানো। "সব গুলি করে মাইরে দিয়ে গেছে, পড়ে আছে। ভেড়ির মাথায় একটা তো দেখলাম। এরকম বসে আছে হেলান দিয়ে, কিন্তু তার বুকে গুলি লেগেছে।" ওখানে সে মরে আছে। পাশে ছিল একটা কেওড়া গাছ। কেওড়া গাছে দেখলাম একটি ভুঁড়ি বাধানো। তারপর প্রথমে একটা পুকুর। প্রথম পুকুরে আমি দেখলাম সাতারোটা লাশ। "সাতারোটা মানুষ বুক ভাসায়ে রইছে।" পাশাপাশি আরও একটি পুকুরে আমি একুশটা লাশ দেখলাম। পুকুরগুলির পানি লাল হয়ে গেছে। এত লাশ দেখে আমার মাথা ঠিক ছিল না। ফলে আমি বাড়ি চলে এলাম। বাড়িতে এসে দেখলাম মা কান্নাকাটি করছে। আমি মনে করলাম মা বুঝি আমাদের না পেয়ে কাদছে। আমি মাকে বললাম, "তুমি কাইন্দো না আমরা সবাই ভালো আছি। সবাই ফিরে আইছি। তখন পাশের বাড়ির এক জেঠিমা আমাকে বলছে যে, "তোরা তো সব ভাল আছিস কিন্তু তোর বাবা যে আর বেঁচে নেই।" একথা শোনার পর আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ আমি কিছুই বলতে পারিনি। তারপর আমি বললাম, "বাবারে দেখতে আমি বাজারে যাব।" কিন্তু বাজারে এসে বাবার লাশ খুঁজে পেলাম না। শত শত লাশের ভিতর থেকে আমার বাবার লাশ খুঁজে বের করা আমার মত অল্পবয়সী বালকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে এলে আমার জ্যাঠাতো ভাই বললো, "নৌকায় করি চলি। আমি সবাইকে নিয়ে দেইখে আইসবোনে। তবে তোরা যদি কান্নাকাটি না করিস তবে আমি নিয়ে যাইতে পারি।" তা আমরা সবাই বললাম, "ঠিক আছে আমরা কান্নাকাটি করব না তুমি নিয়ে চল একটু বাবারে দেখে আসি।" গেলাম। যেয়ে দেখি বসে আছেন। উনার পিঠ দিয়ে গুলি করেছে। বুক দিয়ে বাইরে গেছে। আমরা বাবার লাশ নিয়ে যেতে পারলাম না। বাড়িতে এসে সবাই কান্নাকাটি করতে লাগলাম।

আমার মা বললো, "আমার স্বামীই যখন মারা গেল, তখন আর ইন্ডিয়া গিয়ে কি করবো।" আমরা মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাই এখানে ছিলাম। এখানকার সামাদউল্লাহ, মেহেরউল্লাহর আশ্বাসে আমরা থেকে গেলাম। এরা যুদ্ধের সময় আমাদেরকে সাহায্য করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের পর অন্যরা কোন সাহায্য পেয়েছে কি না জানি না। তবে আমরা কোন সাহায্য পাইনি। আমি মনে করি চুকনগর হত্যাকাণ্ডের বিচার অনেক আগে হওয়া উচিত ছিল। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।

গোপাল কৃষ্ণ সরকার
পিতা : বিজয় কৃষ্ণ সরকার
বয়স : ৪৬
পেশা : অধ্যাপনা
গ্রাম : বরাতিয়া
ইউনিয়ন : আউলিয়া
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে আমি কেশবপুর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। '৭১ সালের মার্চের শুরুতেই কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। ২৫ মার্চ যুদ্ধ শুরু হলে বাবা আমাকে আর কেশবপুর যেতে দিলেন না। মার্চ থেকে মে '৭১ এই তিন মাস আমি বাড়িতেই থাকলাম। ১৯ মে আমি যথারীতি বাড়িতেই ছিলাম। চুকনগর থেকে চার কিলোমিটার পূবে আমাদের বাড়ি। সকাল থেকে প্রচুর নৌকা। সন্ধ্যা পর্যন্ত বটিয়াঘাটা, হেমা, ফকিরহাট, চিতলমারী, ডুমুরিয়া থেকে নৌকা চুকনগরে এসে জমতে থাকে। ফলে নৌকার আর জায়গা থাকে না। ১৯ মে সন্ধ্যায় আমি বাবার সঙ্গে চুকনগরে আসি। এত নৌকা এবং লোকজন দেখে বাবা বলেন, "কালকেই দেশ ছাড়তে হবে, কারণ যেভাবে লোক যাচ্ছে, এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।" রাতে বাবা আর আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

গতকালের দেখা এত নৌকা আর লোকজন আমাকে কৌতূহলী করে তুললো। ফলে পরের দিন অর্থাৎ ২০ মে ভোরবেলায় আমি চুকনগরে চলে আসি। চুকনগরে এসে আমি আমার বন্ধু বিশ্বনাথ মল্লিক, শচীন মল্লিককে নিয়ে নদীর ধারে চলে আসি। নদীর ধার তখন লোকে লোকারণ্য। কেউ রান্না করছে, কেউ খাচ্ছে, এই অবস্থায় সকাল আনুমানিক এগারো সাড়ে এগারোটার দিকে বাসস্ট্যান্ডের দক্ষিণ দিক অর্থাৎ সাতক্ষীরা রোডের দিক থেকে একটি গুলির শব্দে আমি চমকে উঠলাম। দেখলাম লোকজন যে যেদিকে পারছে ছুটছে। আমিও পালিয়ে আধ মাইল দূরে চলে এলাম পরে (চুকনগর বাজার) এসে দেখি শুধু লাশ আর লাশ। প্রথমে গরুহাটা বা কাউন্সিলের সামনে এলাম। দেখলাম এখানে সামনে পিছনে প্রচুর লাশ পড়ে আছে। নদীর তীরে এসে দেখলাম প্রচুর লাশ ভেসে যাচ্ছে। এরপর বাজারে এলাম। দেখলাম সকালে যে বাজার লোকে লোকারণ্য ছিল, সে বাজার খাঁ খাঁ করছে। কোন লোকজন নেই। শুধুমাত্র কতগুলো বুড়ি তাদের স্বামী, সন্তান, পরিবার-পরিজন হারিয়ে কাতরাচ্ছে।



মনোরঞ্জন বৈরাগী
পিতা : কালিপদ বৈরাগী
বয়স : ৪৫
পেশা : কৃষি
গ্রাম : তেলিখালী।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স পনেরো বছরের মত হবে। আশেপাশের গ্রামের লোকজন আমাদের গ্রামে লুটপাট শুরু করে দেয়। প্রায়ই গরু-বাছুর, ধান-চাল নিয়ে যেত। এই অবস্থায় গ্রামের অধিকাংশ হিন্দু পরিবারগুলো ঠিক করে যে, ভারতে চলে যাবে। আমরাও পরিবারের সবাই মিলে চুকনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। জ্যৈষ্ঠ মাসের চার তারিখ, বুধবার বিকেলের দিকে বাড়ি থেকে বের হই এবং পরদিন সকালে চুকনগর বাজারে পৌঁছাই।

পথে কারো কারো কাপড়-চোপড় ভিজে যায়। শুকানোর জন্য মাঠে কাপড় মেলে দিলাম। এর একটু পরেই বাজারের দিক থেকে গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দুই/তিন জন লোক বললো যে, 'নড়াচড়া করবেন না। ফাঁকা আওয়াজ করতেছে, গায়ে-টায়ে লাগবে না।' এভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর গুলির শব্দ ক্রমাগত নিকটবর্তী হতে থাকলো। নিজেদের আর নিরাপদ মনে হচ্ছিলো না। আবার সহজে অন্য জায়গায় যাবারও উপায় ছিল না। কারণ কাপড়-চোপড়, চাল-ডাল, বেডিংপত্রসহ নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় "বাবা ঐ নৌকার ধারে থাকলো আমিও একটা কাঁটা ঝাড় ছিল, বোধহয় পাঁচ-ছয় হাত দূরে, কাঁটাতারের ওপাশে আমি থাকলাম।"

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময়ে ৫/৬ জন পাক সৈন্য হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। আমার বাবাকেও গুলি করে হত্যা করে পাকবাহিনী। অন্তত আট/নয় হাজার মানুষ চুকনগর গণহত্যার শিকার হয়। আমি আমার বাবার হত্যার বিচার চাই।



বিমল মণ্ডল
পিতা : শান্তি রহমান মণ্ডল
বয়স : ৪৫
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : চটচটিয়া
থানা : ডুমুরিয়া।

কৃষিকাজই আমার মূল পেশা। '৭১-এ আমিও একজন

কৃষক ছিলাম। আমিও অন্যদের মত পাকসেনাদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য পরিবার-পরিজনসহ বাড়ি থেকে ঐদিনই চুকনগর এসে পৌঁছি। তখন আমাদের এলাকা থেকে চুকনগর হয়ে ভারতে যাওয়ার একটা রাস্তা ছিল। তাই বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এখানেই জড়ো হচ্ছিলো।

৫ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার দিন, ঝাউডাঙ্গা থেকে তিনটি ট্রাকে করে পাক সেনারা ভিসি বাড়ির পাশে পুটিমারার ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। এসেই ওরা ফাঁকা আওয়াজ করতে থাকে। লোকজন প্রাণের ভয়ে ছুটাছুটি করছিলো। বউ এবং ভাইকে নৌকায় উঠিয়ে দিলাম। ওরা কাছেই ঋষি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বৃদ্ধ বাবা-মাকে সেখান থেকে সরানোর সময় পেলাম না। গোলাগুলি বেড়ে গেল। আমি তখন ঋষি বাড়িতেই আরেকটি ঘরে লুকিয়ে থাকি। সেখান থেকে দেখলাম "পাকসেনারা আমার স্ত্রীর কোল থেকে ছোট ভাইকে টাইনে বাইর করে তাকে মাটিতে শোয়াই দিল এবং সে অবস্থায়ই তাকে ওরা গুলি করে মারে।" আমি সে দৃশ্য দেখে ওখান থেকে বেরিয়ে সংলগ্ন হোগলা বাগানে লুকিয়ে থাকলাম। গোলাগুলি শেষ হবার পর এখানে এসে দেখলাম বাবা-মা বেঁচে আছেন। তাঁরা নৌকার পাটাতনে লুকিয়ে ছিল।

পরবর্তীতে বাবা-মা, বৌসহ নৌকায় বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। মা বার বারই ছোট ভাইয়ের কথা বলছিলো। "ভাইতি কোহানে? আমি বললাম, ভাইতি যাচ্ছে ডাঙ্গায়। তখনো মার মন তো ঠেকানো যায় না, মা চিল্লাইতে লাগলো।" এ অবস্থায় আমি মাকে সত্যি কথাটা জানাতে পারিনি। বার বারই বলছিলাম সে স্থলপথে বাড়িতে যাচ্ছে।

সেদিন এ ঘটনায় নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশুসহ প্রায় ৫/৭ হাজার লোক মারা যায়। গুলিতে ছাড়াও অনেককে বেয়নেট দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মারা হয়। প্রায় ৪/৫ ঘণ্টা গোলাগুলি হয়েছিলো।

যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা বাড়িতেই ছিলাম। ছোট ভাইটি মারা গেল। বাবা বললো, "আর কোন আশায় যাবা। যাতি হবে না। যদি মরি তাই এই জন্ম মাটিতেই মরি।" তাই যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিচার তো অবশ্যই চাই।



রবীন্দ্রনাথ বৈরাগী
পিতা : কালিপদ বৈরাগী
বয়স : ৪৩/৪৫
গ্রাম : তেলিখালী
থানা : ডুমুরিয়া।

দেশে এবং আশপাশের গ্রামগুলিতে যখন লুটপাট শুরু হয় তখন হিন্দুদের মধ্যে একটা আতঙ্ক দেখা দেয়।

তারা চিন্তা করলো দেশে যেহেতু শাসন নেই, সরকারের তরফ থেকে ডাকাত এবং লুটপাটের জন্য লোক ছাড়া, তখন এদেশে থাকা চলবে না। যে জায়গায় শাসন নেই, সে জায়গায় থাকা যায় না। আপনি সংসারে একটা গার্জিয়ান, গার্জিয়ান যদি আপনি শক্ত না হন আপনার সংসার চলবে কি করে? আমরা বহু লোক চুকনগর হয়ে ভারত যাব এ উদ্দেশ্যে বুধবার রাতারাতি সেখানে পৌঁছাই। ভাড়াটে নৌকায় না এসে আমাদের ফ্যামিলির লোকগুলিকে নিয়ে নিজেদের নৌকায় নিজেরাই বইয়ে নিয়ে আসি। চিন্তা ছিল নৌকাখান সেখানে বিক্রি করে দেয়া বা সেখানে রেখে যাওয়া।

সকালে খাওয়া-দাওয়ার জন্য পাক-শাক হতে লাগলো এরি মধ্যে কলেজের দিক হতে গুলিগোলার শব্দ শোনা যায়। আমাদের এই নদীর সাইডে তখনও খবর পৌঁছায়নি যে লোক মারতেছে। কিন্তু গুলির শব্দ আস্তে আস্তে দেখি 'আগুচ্ছে'। কয়েকটি লোক দৌড়ায়ে যাচ্ছে আর "কচ্ছে 'দাদারা আপনাদের কোন অসুবিধা নাই, তোমরা কেউ নড় না' বলে 'এডভেটাইজ' দিচ্ছে।" তারা নানান তাল 'বাইতে' লাগলো। যতই তারা নানা তাল করুক লোকের মনে ভয় ঢুকলে তখন মন ঠিক থাকে না। লোকজন ভয়ে কেউ গাছের আড়ালে, আম বাগানে, খানার মধ্যে যেয়ে বসলো। কেউ আবার নৌকাতে বা নদীর পার হয়ে গেল। খানেরা যখন নদীর পাড়ে আসে তখন আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। দৌড়াবার কায়দা থাকলো না। আমি দৌড়ায়ে বাগানের ভেতর চলে গেলাম। ওরা (আর্মি) গুলি করে মেরে চলে যাবার পর এসে মালপাড়ার পুকুরে বাবা আর এক জেঠামশাইকে মরা পেলাম। পুকুরটির জল লাশে লাশে সম্পূর্ণ রক্তে লাল ছিল। গুলিতে বাবার মাথার 'খাবরি' উড়িয়ে নিয়ে গেছে 'কনে' তার ঠিক নাই। "বাপ মরলে ঐ টাইমে তো কানতে হয়, তা ঐ টাইমে সেই সুযোগটা উপরঅলা দেয়নি।" বাবার কাছে যে টাকা-পয়সা ছিল তাও যে নিব কিছু মনে ছিল না। আমার কাকা বললো, রবী তোমার বাবা তো এভাবে মারা গেল, এখন তুমি এদের (মা, ভাই-বোনদের) নিয়া কি করবা, তোমার মামাদের ওখানে চলে যেতে পারো। মামা বাড়ি যাবার পথে রাজাকারের দল নৌকায় যা ছিল পয়সা-কড়ি, চাল-ডাল মোটামুটি সব লুটপাট করে নিয়ে যায়। আমাদের নদীর সাইডে চার থেকে পাঁচ হাজার লোক মারা যায়। ঘটনার পর আমরা বুঝতে পারলাম স্থানীয় কিছু দালাল লোক ওদের (আর্মি) সাথে জড়িত ছিল। বিচার সেটা তো অবশ্য প্রত্যেকে চায়। কিন্তু চাওয়ার জন্য পেছনের একটা শক্তি লাগে। শক্তি লাগে না?



বিজয় কুমার রায়
পিতা : ঈশ্বর কার্তিক চন্দ্র রায়
বয়স : ৪৫
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : আলাদিপুর
ডাকঘর : মাগুরখালী
থানা : ডুমুরিয়া।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। চুকনগর গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। আমার চোখের সামনে আমার বাবা, কাকা মারা যান। মা এবং স্ত্রীর গুলি লাগে। চুকনগরে এসেছিলাম ভারত যাব বলে। কারণ গ্রামে আর থাকতে পারছিলাম না রাজাকারদের অত্যাচারে। ওরা গরু-বাছুর, ধান-পাট যা পায় তাই লুট করতে শুরু করলো। এই অবস্থায় ঠিক করলাম ভারতে চলে যাব। গ্রামের অন্যান্য পরিবারসহ জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে গ্রাম ছেড়ে নৌকায় করে চুকনগরে এলাম। এখানে পুটিমাড়ির বিলে বা সিএনবি'র রাস্তার পাশে আশ্রয় নেই।

কিছুক্ষণ পর দেখি দক্ষিণ দিক থেকে এক ট্রাক পাকিস্তানি সৈন্য এসে নামলো। নেমে "উড়ো ফায়ার করলো দুটো তিনটে।" সবাইকে চুপ করতে বললো যেন 'টু শব্দ'টি না হয়। তারপর অনেক লোক ধরে লাইনে দাঁড় করালো। কিছু লোক ঝোপ-ঝাড়ের ভেতরে লুকালো। আমি বাবা-মা-স্ত্রীসহ এক ঝোপের পাশে দাঁড়ালাম। এর মধ্যে যাঁদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে তাদের গুলি করলো, তারপর লক্ষ্যহীনভাবে করতে থাকে। হঠাৎ গুলি এসে লাগলো বাবার গায়ে। ঘটনাস্থলেই বাবা মারা যান। আমি তখন ডুব দিয়ে একটা নৌকার আড়ালে চলে যাই। সঙ্গে মা এবং আমার স্ত্রীও ছিল। জলের ভেতরে নাক উঁচু করে কোনক্রমে নিঃশ্বাস ছেড়েছি। এরই মধ্যে দেখলাম এক মুসলমানের নৌকায় সেনাবাহিনীর লোকজন ঘুরছে। যারা আহত ছিল তাদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করছে। এই অবস্থা দেখে মাকে বললাম আর বাঁচা সম্ভব নয়। "এমন সময় গুলি করলো আমার মার কপালে। তখন আমার গায়ে ছিলো জামা। সেই জামা ছিঁড়ে মার ঐ চোখ বাইধে দিলাম। তারপরে আমার স্ত্রীর দেখি কানে লাগলো। আচ্ছা কানে লাগলে কান ঐ এক জামা ছিঁড়ে বাইধে দিলাম। দেওয়ার পরে তখন আমি বললাম ওদের, যে তোমরা এইখানে থাকবা। আমি যদি বাঁইচা থাকি তাহলে আমি তোমাদের ধারে আসবো। আর যদি না আসি তাহলে মনে করবা মারা গেছি।" সেনাবাহিনী চলে গেলে, ডুব দিয়ে সাঁতরে পাড়ে গিয়ে উঠলাম। সেই দিন আমার শ্বশুর বাড়িতে থাকলাম। তারপর আলাদিপুর থেকে বদরতলার পথে ভারতে চলে যাই।

চুকনগরে অগণিত লোক হত্যা করা হয়। শেখ মুজিবরের সরকার আমার মাকে দুই হাজার টাকা সাহায্য করেছিলো। চুকনগরে আমার বাবা এবং পাঁচ কাকা জীবন হারালো। চুকনগরের ঘটনার পর আমরা ভারতে হাসনাবাদে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হলে ফিরে আসি।

বিনয় রায়
পিতা : মৃত মন্মথ রায়
বয়স : ৪৫
পেশা : শিক্ষকতা
গ্রাম : শিবনগর
ডাকঘর : শিবনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ঘটনার দিন আমরা নৌকাযোগে চুকনগর পৌছি। চুকনগর বিলে আমাদের নৌকা ভিড়ে। আমরা যখন নৌকা থেকে মালপত্র নামাচ্ছি, তখন দেখি খান সেনাবাহিনীর একটি ট্রাক উত্তর দিকে গিয়ে মেইন রোড দিয়ে চলে যায়। আর একটা গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে ঢোকে। ঢোকার পরে দু'দিক দিয়ে গুলি শুরু করে। আমরা তখন খালের পারে মাটিতে বসে থাকি। হঠাৎ একটা গুলি এসে মায়ের কোলের ছোট বোনটির মাথায় লাগে। ছোট বোনটির মাথা গুলিতে উড়ে যায়। সে গুলিতে আমার মাও আহত হয়। এ ঘটনা দেখে আমার বাবা নিজেই লাইনে গিয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় খান সেনাদের গুলিতে আমার বাবা মারা যায়। বাবার লাশ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু নেওয়ার কোন সুযোগ পাই নি।

পাকবাহিনী গাড়ি থেকে নেমেই গুলি করতে শুরু করে। আমাদের সঙ্গে অনেক বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তারা বলেন, "হাত উঁচু করো, সারেন্ডার করো তাহলে হয়তো গুলি করবে না।" আমাদের বয়স খুব কম, ক্লাশ এইটের ছাত্র। তখন হাত উঁচু করলাম কিন্তু কোনটাতেই নিষ্কৃতি নেই। ফায়ারিং শুরু হলো। সে ফায়ারিংয়ে আমার বোন ও বাবা মারা গেল। ঐদিন আনুমানিক পাঁচ-সাত হাজার লোক মারা যায়। আমার বড় ভাই গুলিতে আহত হয়। কিন্তু কিছুতেই রক্ত বন্ধ হচ্ছিলো না। আমরা আমাদের গায়ের সমস্ত পোশাক খুলে তার গায়ে ঠেসে ধরলাম। কিন্তু রক্ত কোনভাবেই বন্ধ হয় না। তখন আমরা গোপনে ডাক্তারকে বাড়িতে নিয়ে আসলাম। ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করে দাদাকে সুস্থ করলেন। কিন্তু আমার মায়ের স্তনে গুলি লাগায় গ্রামে তার চিকিৎসা সম্ভব হয় নি। বিনা চিকিৎসায় তিনি মারা যান। মা মারা যাবার পর আমরা স্কুল শুরু করলাম। একদিন স্কুল থেকে বাড়িতে আসার পথে এলাকার একজন মুসলিম লীগ নেতা (যার নাম আমি বলবো না) আমার বুকে ছুরি ধরে। আমি তার কাছে কাকুতি মিনতি করি। আমার অনুনয়-বিনয়ের পর উনি আমাকে ছেড়ে দেন। আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। রাজাকারদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় আমরা ভারতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেই এবং এক সময় চলে যাই। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।



সনজিত গাইন
পিতা : মৃত বাদল গাইন
বয়স : ৪৫
পেশা : শ্রমিক
গ্রাম : ১ নং জলবাউনিয়া, দাউনিয়া ফাঁদ
ডাকঘর : ছয়ঘড়িয়া
থানা : বটিয়াঘাটা।

আমি তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। বয়স ১৫/১৬। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে পাকবাহিনী গানবোটে এসে চাপড়াখালি স্কুল এবং তার আশেপাশের এলাকায় গুলি শুরু করে। আমরা তখন এ এলাকা ছেড়ে বটিয়াঘাটা এলাকায় আশ্রয় নিই। যখন এখানেও গুলি শুরু হয় তখন আমরা নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এ উদ্দেশ্য নিই চুকনগর হয়ে ভারতে যাব বলে ঠিক হয়। রাত্রি যখন দ্বি-প্রহর আনুমানিক ৩টার সময় আমরা চুকনগর বাজারে পৌছি। সেখানে তখন অগণিত লোকের সমাগম। সেজো ভাই নিতাই গাইন এবং ভাইপো বিনয় পিছনে পড়ে যাওয়ায় তাদের জন্য আমরা বাজারেরই এক বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছিলাম। এমনি সময় সাতক্ষীরা থেকে পাকবাহিনী ট্রাকে করে চুকনগর বাজারের দক্ষিণ সাইডে এসে নামে। পাকিস্তানি পতাকা নিয়ে তাদের অগ্রভাগে সাদা পোশাক পরে কয়েকজন এসেছিলো। এক এক গ্রুপে ওরা পাঁচ থেকে ছয়জন করে প্রায় ২৫/৩০ জন ছিল। মোট পাঁচটি গ্রুপ ছিল। তাদের হাতে রাইফেল এবং হালকা মেশিনগান ছিল। দুটো অস্ত্রই তারা পায়ের ওপর রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফায়ার করছিলো। আমরা ওদের থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে ছিলাম। মহিলা, শিশু এবং যাদের দাঁড়ি-গোঁফ ওঠে নাই তাদের ছাড়া বাকিদের লক্ষ্য করে ওরা গুলি করছিলো। আমার জ্যাঠাইমা ভাইপো বিনয়কে গুলি করার সময় তাকে জড়িয়ে ধরায় সেও সেখানে মারা যায়।

বাজারের দক্ষিণ দিক থেকে গুলি শুরু হলে আমরা উত্তর দিকে কালী মন্দিরের পাশে একটি দোকানের বারান্দায় আশ্রয় নেই। তখন জ্যাঠা মশাইয়ের নিকট সব বাচ্চারা বসা ছিল। জ্যাঠাতো বোন (৩) তাকে হাত ধরে ওরা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তাছাড়া জ্যাঠাতো ভাই ঈশ্বর তার কোলে ছিল, ছোট ছেলে সুধাকর তাদেরকেও ছুঁড়ে ফেলে জ্যাঠা মশাইকে গুলি করে। আমার বড় ভাই রণজিত গাইন, সে সময় সে এস.এস.সি পরীক্ষার্থী, তাকে রাইফেল পেটে চেপে ধরে গুলি করলো। আমার বাবা বারান্দায় বসা ছিল, তাকেও গুলি করে। প্রায় দুই ঘণ্টা অনবরত গোলাগুলি করে তারা চলে যায়। সেদিন ওরা আমার বাবা, বড় ভাই, জ্যাঠামশাই, পিসতুত ভাই, পিসেমশাই, জ্যাঠাতো ভাই, ভাইপো এবং জ্যাঠামশাইসহ মোট ৯ জনকে হত্যা করেছিলো। তাছাড়া সেদিন বাজারে যত লোক ছিল তারা কেউই রেহাই পায়নি। গাছের ওপরে, শিকড়ের নিচে যারা আশ্রয় নিয়েছিলো তাদেরকে হত্যা করা হয়।

জ্যাঠাতো ভাই নিতাই গাইন চুকনগর বাজারের এক দোকানের বারান্দায় টানানো মাদুরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকায় সেদিন বেঁচে যায়। এই ভাই-ই সেদিন আমরা যারা বেঁচে ছিলাম তাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ যেমন আমার মা, জ্যাঠাইমা, পিসিমা তাদের একটি শাড়িতে বেঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে নদীর এক সাইড ধরে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঐদিনই আমরা কাঠ কাটার বড় একটা নৌকায় করে বদরতলীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। কিন্তু সে সময় আমাদের কাছে কোন টাকা ছিল না। তখন আমরা কয়েকজন পুনরায় চুকনগর বাজারে ফিরে আসি। এসে দেখি আমার বাবা, জ্যাঠামশাই বা আমার বড় ভাই এদের লাশগুলো সব বারান্দা থেকে নিচে নামানো। তাদেরই একজনের পকেটে কিছু টাকা পেয়ে তা নিয়ে আমরা চলে যাই। "পরের দিন আমাদের লাশের জন্য নদীতে নৌকা নিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা ছিল না।" তারপর আমরা ইন্ডিয়ায় চলে যাই।

"আমার পরিবার থেকে দুইজন লোক মারা গেল। আমার বাবা, আমার বড় ভাই এরা যদি বেঁচে থাকতো তাহলে আমার এ অবস্থা হইত না। আজকে আমি সামান্য শ্রমিক। এইজন্য যারা দায়ী আমি তাদের বিচার অবশ্যই চাই।"



বকুল রায়
পিতা : অতুল রায়
বয়স : ৪৫ বছর
পেশা : স্কুলে দপ্তরির কাজ
গ্রাম : শিবনগর
ডাকঘর : পশ্চিমনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

আমি তখন স্কুলের ছাত্র। চুকনগর গণহত্যার দিন আমরা ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে বাড়ি থেকে রওয়ানা হই। চুকনগরে একদিন থাকবো এবং পরবর্তীতে ভারতে যাব। সঙ্গে ছিল আমার বাবা, মা, ছোট ভাইসহ চারজন। তারিখটা ছিল মে ২০ এবং জ্যৈষ্ঠ মাস। ঠাকুরদার পালতোলা নৌকা করে চুকনগর এলাম। তখন সেখানে আমাদের গ্রামেরই বহু লোক ছিল। নদীর ঘাটে চারদিকে শুধু নৌকা আর নৌকা। এ দেখে মা বললো তোরা বেডিংপত্রগুলো ডাঙ্গায় তোল, রান্না করতে হবে। বেডিং ডাঙ্গায় তুলছি এমনি সময় মা বললো, "বিপদ আইয়ে গেছে, আর বাঁচতি হবে না। মিলিটারি আইয়েছে।" দেখলাম পাকসৈন্যরা গাড়ি করে এখানে এসে নামলো। আমরা এখানে আসার ১০/১৫ মিনিট পরই পাকসেনারা এখানে এলো। তখন সবাই বলছে হাত উঁচু কর, হাত উঁচু কর। আমার মা বললো তোরা পালিয়ে যা, আমি তখন নৌকার নিচে পাটাতনে লুকিয়ে থাকি। বাবা, মা, ভাই নৌকায় রয়ে গেল। এলোপাতাড়ি গুলিতে হঠাৎ একটা গুলি মা'র

চোখের ভিতরে ঢুকে পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। একটি চোখ তার বেরিয়ে এলো। মা তখন চিৎকার করে "কলি মাগো বাবারা আর বাঁচতে পারলি না।" আমি নৌকায় উঠে দেখি মা পড়ে আছে। চারদিক থেকে গুলির শব্দ হচ্ছে, যে যেখানে পারছে পালাচ্ছে, বাঁচাও, মরে গেলাম। এ ধরনের বিভিন্ন রকম কথা শোনা যাচ্ছে। আমি তখন উপায়ন্তর না দেখে বাবা, মাকে রেখে ভাইকে নিয়ে পালিয়ে গেলাম।

সেদিন আমাদের গ্রামের প্রায় ১৮/১৯ জন লোক মারা যায়। সব মিলিয়ে ৫/৬ হাজার লোক মারা যায়। আমাদের গ্রামের কয়েকটা লোক আহত হয়েছিলো। এর মধ্যে আমার কাকার পিঠে গুলি লেগেছিলো, সে এখনও বেঁচে আছে। আমার ঠাকুরমা'র গুলি লেগেছিলো। সে ২/১ বছর পর মারা যায়। এ ঘটনায় আমার মা মারা গেছে। বাবা আর বিয়ে করেন নি। বাধ্য হয়ে আমাকে ছোটবেলায় বিয়ে করতে হয়েছে। পড়াশুনা আর হয়নি। সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমার এ বিপর্যয়ের জন্য যারা দায়ী আমি অবশ্যই তাদের বিচার চাই।



মুকুন্দ বিহারী রায়
পিতা : নরেন্দ্রনাথ রায়
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম+পোঃ : শিবনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

চেয়ারম্যান বলেছিলেন এলাকার (চুকনগর) পরিস্থিতি ভাল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভোমরা বর্ডার দিয়ে ভারতে যাব বলে এখানে আসি। স্নান করবো বলে মাথায় তেল দিয়ে একটা গামছা নিয়ে আমি নদী/বিলে নামি। বিলে তখন জল ভর্তি। জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম একটা লরীতে ভর্তি আনুমানিক পনেরো-ষোল জন মিলিটারী বাজারের ঐ যে নিচের রাস্তাটা আছে ঐ রাস্তার উপরে নামে। ওখান থেকে পশ্চিম দিকে কয়েকটা ফায়ার করে। পশ্চিম দিকে কিছু লোক ছিল, দেখলাম কিছু লোক পড়ে গেল। তারপর বিলের দিকে এসে ফায়ার করে। জল থেকে নৌকায় উঠে আমার শ্বশুরকে বললাম—অবস্থা খুব খারাপ চলেন এখান থেকে চলে যাই। বলতে বলতে গুলি আরম্ভ হয়ে গেল। আমার মেয়ে দুটোকে নিয়ে আমি জলে লাফ দিয়ে পড়লাম। ওদের মা ছোট ছেলের হাত ধরে নামলো। আমরা নৌকার তলায় গেলাম। তখন এমন বিপদ যে আমার শ্বশুরকে ডাকতে পারলাম না। প্রাণের ভয়ে তখন একটা বিছানা মুড়ি দিয়ে ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে এক মুচীর বাড়ি যেয়ে উঠলাম। আমার স্ত্রী মাথায় কাপড় বা কিছু একটা দিয়ে এলো। সেখান থেকে কিছুদূর এগিয়ে সামনে একটা শুকনো গভীর পুকুর পেলাম। পুকুরের পাশে একটা ঘর আছে চারিপাশে বারান্দা মুলি বাঁশের বেড়া দিয়ে আটকানো। আমি

বাচ্চাদের নিয়ে ঐ ঘরে উঠে দেখি ভিতরে লোক ভর্তি। তখন ঐ পুকুরের নিচে যেয়ে বসলাম। ওখানে বসার ঘণ্টা দেড়েক পর এই ধার দিয়ে একবার মিলিটারী ঘুরে যায়। এখানকার বাসিন্দা, স্থানীয় লোকজন তারাই সব পথঘাট দেখিয়ে দেয়। পুকুরের ভেতর বসেই দেখি কয়েকটা লোক ঐ মুলি বাঁশ দেয়া ঘরটার সামনে এলো। ওখানে প্রায় একশ থেকে সোয়াশ লোক ছিল। আর্মি যেগুলো সৈনিক তাদের দেখলেই তো চেনা যায়। এক-দুই জন মিলিটারী দৌড়াইয়ে এসে বলছে—"এ ধারমে আও মালাউন"। এ কথা শুনে আমার বাচ্চাদের নিয়ে কাঁটার পাশে ঝাপ দিয়ে ঐ পাশে পড়ে দৌড় মারলাম। বাচ্চাগুলো আমার পিছন পিছন আসে। ওদের বয়স ছিল বড় মেয়ের চৌদ্দ, মেজ মেয়ের দশ এবং ছেলের ৫ বছর। আমরা বাজারের এই সাইডে পশ্চিম দিক কাঁঠাল তলার দিকে এলাম। এসে নদী পার হয়ে ঐ পাড় চলে গেলাম!

আমার স্ত্রী ঐ পুকুরের ভেতর থেকে গেলো। পরে বার হয়ে কাঁঠালতলায় এসে বট গাছের ভিতরে ছিল। ওখানে ছিল ষোল-সতেরো জন মেয়ে, আর নয়জন পুরুষ ছেলে। মিলিটারী এসে সবাইকে টেনে বার করেছে। মেয়েছেলেদের আর কিছু করে নাই। পুরুষদের রাস্তার পরে ফেলে গুলি করে বেয়োনেট দিয়ে কোপাইয়ে কুচি কুচি করে মারে। ঐ পুকুরির মধ্যেও মেরেছে প্রায় সত্তর-আশি জন। বাঁশের ঘরে একশ থেকে সোয়াশ লোক ছিল সবাইকেই মেরেছে। নদীর এপারে আসার পর আমার মেয়ে দুটো ওর মার জন্য কান্নাকাটি করতে লাগলো। আমি ওদের বললাম—তোরা এগিয়ে যেয়ে দেখ মিলিটারী আছে কি না। আমি যদি যাই তাহলে আমাকে ফায়ার করবে। আমার মেজ মেয়ে বলে বড়দি না যেয়ে আমি যাই। ওদের মা আমাদের না পেয়ে পাগলের মত হয়ে কেঁদে-কেঁদে বুক থাপড়াতে থাপড়াতে আসে। আমরা সব এক জায়গায় হয়ে চলে এলাম। "সেইসব দৃশ্য যা বলা যায় না, কতি গেলে চোখে জল আসে।"

ওরা এগারোটা-সাড়ে এগারোটার সময় এসেছিলো। কোন কথা না বার্তা না, প্রথমে নেমেই গুলি করলো। সবাইকে বললো তোমরা লাইন ধর। লাইন ধরে সারেন্ডার, হাত উঁচু করলে আর গুলি করবে না। শেষে ওরা আর তা মানেনি। আমাদের গেরামের পাঁচ-সাতশো মানুষ সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সমস্ত লাইন ধরেই ফায়ার করতে শুরু করে একটাও বেঁচে ছিল না। তেলিখালি, বটিয়াঘাটা, বড় বাড়ি, শিবনগর, আলাদীপুর, আসান নগর, চরচরিয়া এই সমস্ত এলাকারও অনেক লোক মারা যায়।

বিকেল চারটার দিকে আমার শ্বশুরের খোঁজে আবার ফিরে এসে দেখতে পাই মরার পর মরা পড়ে আছে। সমস্ত জায়গা ভর্তি। রাস্তাঘাট রক্ত রঞ্জিত। মেইন রোডের মধ্য দিয়ে হাঁটার কায়দা ছিল না। রক্ত শুধু রক্ত। বাজারে ফায়ার করার সময় ১০-১৫ জন মহিলা মারা যায়, যারা রক্তের মধ্যে পড়েছিলো। বিকেলের দিকে বিলের জল তখন সরে গেছে দেখি আমার শ্বশুর মরে পড়ে আছে। মাথার খাপড়াটা উঠে গেছে। মনে হয় উনি সাড়ে বারোটা নাগাদ মারা গেছেন। উনি আমাদের সাথেই থাকতেন। আমার স্ত্রী লাশ জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

আমার শ্বশুরের লাশ পড়ে থাকলো, বহু লাশ আমার গ্রামেরও। আমার গ্রামের কয়েকজন লোক ছিল যারা ঐ দৌড়ে পালিয়ে ছিল তারা এসে আহত ও নিহতদের কিছু বাড়ি নিয়ে গেছিল। আমার মেজদারও গুলি লেগে পা ভেঙ্গে গিয়েছিলো। ভাগ্নে নারায়ণ যখন পালাচ্ছিলো তাকে প্রথমে গুলি করে পরে বেয়নেট দিয়ে কুপিয়ে ছিলো। বাড়ি যাবার পথে সে মারা যায়। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে মরেছিলো পিসেমশাই কালীপদ, তার ছেলে সুশীল, ভাইয়ের শ্বশুর হরেন্দ্রনাথ সানা, জ্যাঠাতো ভাই রঘুপদ সানা, মামা মন্ময়, ওনার মেয়ে জামাই কয়টা বলবো?

আমাদের এখানে বাড়িতে 'মশু' থাকে যারা জমি গড়ার (চাষ আবাদ) জন্য ছেলেপেলে নিয়ে ঘর বেঁধে লোকের বাড়ি থাকে। আমাদের বাড়ির 'মশু' তার নাম মঙ্গল, বয়স সতেরো-আঠারো মুচী বাড়ির ধারে ওকে বেয়নেট দিয়ে কোপায়ে মারলো। কুড়ি-বাইশ হাত দূর থেকে ঘরের আড়াল হতে আমি মেয়েদের ওপর অত্যাচার হতে দেখি। আমি ঠিক সেভাবে দেখেনি। তবে দুটো দৃশ্য আমার মনে আছে। আমি যে সময় নদীর ধার দিয়ে যাই সেই সময় একটি মেয়ে দেখলাম জলে সাতরাইতে যেয়ে জলে ডুবে গেল। আর আমি সে সময় নৌকা থেকে নামলাম সে সময় একটা ছই দেয়া নৌকার ভেতর মিলিটারী, খান সেনারা ঢুকে একটা মেয়েছেলেকে ধরলো। শাশুড়ী ওকে টেনে বাইরে নিয়ে আসতে চাইলো আর ওরা (আর্মি) টেনে ভিতরে নিতে চায়। সে সময় শাশুড়ীকে ধাক্কা দিয়ে নদীর জলে ফেলে দিয়ে ওকে ভেতরে নিয়ে গেল। ওরা ঐ কাঞ্চন নগর থেকে এসেছিলো। একজন আর্মি নৌকার ভেতর ওকে নিয়ে গেল আর একজন উপরে ছিল। মেয়েটার বয়স ছিল সতেরো-আঠারো। বিছানামুড়ি দেয়া অবস্থায় যেটুকু দেখা যায় তাই দেখলাম। ঐটুকুই যথেষ্ট, ঐ সময় ঐ বয়সে, ঐ সমস্ত দৃশ্য দ্যাখারও আর ইচ্ছা থাকে না। বাড়িতে ৫-৭ দিন থাকার পর আমরা ভারতে চলে যাই।

এদের ন্যায্য বিচার হওয়া উচিত। কেন তারা হত্যা করলো নিরীহ মানুষকে?



মনোজ কান্তি রায়
পিতা : মৃত প্রফুল্ল রায়
বয়স : ৪৪
পেশা : ব্যবসা
গ্রাম : আলাদীপুর
পোস্ট : মাগুরখালী
থানা : ডুমুরিয়া।

'৭১ সালে আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। কইপুকুড়িয়া স্কুলে পড়তাম। চুকনগর গণহত্যার আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

মে মাসের ১৪/১৫ তারিখে আমাদের এলাকার প্রভাবশালী লোক পুলিন বাবু

এবং তার ভাইকে খুন করা হয়। তারা খুন হবার পর এলাকায় সবার মধ্যে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়। তখন লোকজন এ পরিস্থিতিতে ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আমরাও সে মোতাবেক বাড়ি থেকে রাতের বেলায় নৌকায় রওয়ানা হই। ২০ মে বৃহস্পতিবার বেলা ১০টা নাগাদ চুকনগরে পৌঁছি। তখন পর্যন্ত কিছুই খাওয়া হয়নি। ইচ্ছা ছিল সাময়িক বিরতি দিয়ে খাওয়াটা সেরে নিয়ে আবার রওয়ানা করবো। সেজন্য নৌকা থেকে বেডিং পত্র নামানো হচ্ছিলো, কেউ কেউ নামিয়ে ফেলেছে এমনি সময় সাতক্ষীরা থেকে পাক বাহিনীর দুটো গাড়ি চুকনগরে বর্তমানে যে কলেজ সেখানে এসে থামে। বাবা তখন বলছিলেন মিলিটারি গাড়ি এসেছে। সে সময় সেখানে আমার পরিবার ছাড়াও আমার কাকার পরিবার ছিল।

গাড়ি থেকে পাক সেনারা লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। দেখলাম তার পরই তারা বিলের মধ্যে নেমে যাচ্ছে। বিলে তখন অল্প অল্প কাঁদা। এ দেখে আমার ভালো না লাগায় গায়ের শার্টটি খুলে ফেললাম। প্যান্টটি শুধু পড়া থাকলো। ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনে ভয়েতে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম অর্থাৎ জমির আইলের পাশে সেখানেই মাটিতে শুয়ে পড়লাম। আমার পাশাপাশি বাবা কাকাসহ ফ্যামিলির অন্য যারা আছেন সবাই বসে পড়লেন। মাথার ওপর দিয়ে গুলি চলে যেতে লাগলো। পরক্ষণেই দেখলাম বাবা পড়ে গেলো। বুঝতে পারলাম বাবার গায়ে গুলি লেগেছে। তখন আমার মা ও ছোট ভাই তার পাশে ছিল। ভাইটি কাঁদতে থাকায় বাবা বলছিলো "বাঁচতে চাও তো ওর মুখের ভিতর হয় মাটি না হয় কাপড় দেও।" এটাই ছিল তার শেষ কথা।

খান সেনারা বিলের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় শুধু গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। ধোয়ায় কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। আনুমানিক দুপুর ১২টা, জ্যৈষ্ঠ মাস, জোয়ারের জলে বিল ভরে গেছে। অতিরিক্ত গরম হয়ে গেছে জল। বয়সে ছোট ছিলাম বলে সে জল আমার সহ্য হচ্ছিল না। ঠাণ্ডা জলের জন্যে খালি এপাশ ওপাশ করছিলাম। সে সময় একজন খান সেনা দৌড়ে আমার কাছে এলো। জমির আইলের ওপর আমাদের একটা সুটকেশ রাখা ছিল, সেটা দেখে বলে "সোনা, দানা রুপিয়া কিছু আছে নাকি? তো আমি বললাম যে নেহি হে। ও তখন সুটকেশটা আলগা করে দেখলো যে কিছু রুটি তৈরি করা আছে। ঐ দেখে চলে গেল।" এর কিছুক্ষণ পর আরেকজন বিহারী এসে জিজ্ঞেস করলো "তুম হিন্দু হে না মুসলিম হে? আমি বললাম হিন্দু হে। তারপর বললো মোহাম্মদের যে কলেমা আছে এটা পড়তে। আমি না বলায় সে অনেক জোর করতে লাগলো। শেষে তার হাতের অস্ত্রটি আমার দিকে তাক করলো। তখন আমি লা ইলাহা মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলার পর খান সেনাটি চলে গেল।" বাঙালি একজন তার সাথে ছিল, সে বললো তুমি এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যাও। এখানে উল্লেখ্য সে দিনের হত্যাকাণ্ডে পাক সেনাদের সাথে কয়েকজন বাঙালিও ছিল।

বেলা চারটা বাজে, দেখলাম গুলি করতে করতে ওরা জলে নেমে যাচ্ছে। সেখানে কিছুক্ষণ গোলাগুলি করে যাওয়ার পথে কিছু মেয়েদের গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। তারপর দেখলাম কাকা চলে গেছে, মা ছোট ভাইদের নিয়ে চলে গেছে,

বাবার লাশটি আমার সামনে পড়ে আছে। তার মুখটা কালো হয়ে গেছে। সাদা শার্টটিতে রক্তের দাগ লেগে আছে। এ অবস্থায় আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছিল। আমি আবার বসে পড়লাম। "তারপর আমি হামাগুড়ি দিয়ে কাদার মধ্যে হাঁটতে লাগলাম। তখন বিলের জল ৮/৯ ইঞ্চি উচ্চতা হবে। সমস্তটা জল রক্তে লাল ছিল। যা হউক কিছুদূর গিয়ে একটা খাল ছিল, সেখানে যেয়ে পড়লাম। খালের জলটা ঠাণ্ডা থাকায় শারীরিক একটু স্বস্তি পেলাম। কিন্তু ২/৪ হাত পার হয়ে দেখছি ৫/১০টি করে লাশ পড়ে আছে। এমনিভাবে পুটিমারী বিল লাশে ভরা ছিল।" সেদিন আমার পরিবারের আমার বাবা, কাকা, কেশব রায় ও কার্তিক রায়, কেশব রায়ের ছেলে দেবনাথ রায়, দুর সম্পর্কীয় এক কাকা শিবপদ রায়সহ মোট ৫ জন মারা গেছে।

পরবর্তীতে আমি একটি নৌকা পেয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা করলাম। কাঁঠালিয়া গ্রামের দিকে যাবার পর বাড়ির লোকজনের সাথে দেখা হতে লাগলো। এভাবেই যারা বেঁচে ছিল তারা কেউ নৌকায়, কেউ হেঁটে এ জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যায়। আর আমি পরদিন সকালে বাড়িতে পৌঁছি। সেখানে রান্না চড়িয়েছে মা, দুটো খাব বলে, এমনি সময় রাজাকাররা এসে পড়লে আমরা সবকিছু সে অবস্থায় রেখে এক আত্মীয়ের বাড়ি চলে যাই।

সেদিনের হত্যাকাণ্ডে অনেকে আহত হয়েছিলো। তারমধ্যে আমার এক কাকী মা এবং জ্যাঠাই মাও আহত হয়। তারা এখনও বেঁচে আছেন। তাছাড়া আমার পরিবারের ৫ জন সহ সেদিন প্রায় ৪/৫ হাজার লোক সেখানে মারা যায়। সুতরাং হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচার তো চাই অবশ্যই।



খোকন রায়
পিতা : ঈশ্বর শ্রীশধর রায়
বয়স : ৪৪
পেশা : কৃষি
গ্রাম : খড়িবুনিয়া
দশ নম্বর ভাণ্ডার পাড়া ইউনিয়ন
থানা : ডুমুরিয়া।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ১১ বছর। তখন স্কুলের ছাত্র। একাত্তরের ২০ মে তারিখে গ্রামের বাড়ি থেকে বাবা, মা, ভাই, বোন, ভগ্নিপতি সহ পুরো পরিবার নিয়ে নৌকায় করে চুকনগরে এসে পৌঁছাই।

নদীর পাড়ে বাঁশতলার কাছে একটি ড্রেনের ভেতরে বেডিং পত্র রেখে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। বাবা বললেন আমি এখানেই থাকি। তোমরা পাশের ফাঁকা ঘরে থাক। হঠাৎ করে গুলির শব্দ পেলাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী নদীর পাড় থেকে গুলি

শুরু করেছে। যে যেদিকে পারছে নিরাপত্তার জন্য ছুটছিলো। "বাবাকে হাত ধরে টানলাম, বাবা আইসো কিছুর দরকার নাই, জীবনে বাঁচ। বাবা উঠলো না। তখন বাবাকে প্রথমে গুলি করে মাথায়, গুলি করলে কাত হয়ে যায়। তারপর আবারও গুলি করে। এইভাবে বাবা মারা যায়।"

চারিদিকে কেবল রক্ত আর রক্ত এরই মাঝে স্বজন হারানো মানুষের ছুটোছুটি। পা ফেলার জন্য কোন মাটি ছিল না। নদীর-ধার মাঠ, লাশ আর রক্তে ভরে গিয়েছিলো। লাশের ওপর পা ফেলে ফেলে ফিরে আসি নৌকায়। আর ভারতে যাওয়া হয়নি। কোন রকমে জীবন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

"বড় দুঃখ, বাবার শ্রাদ্ধ শান্তি কইরতে পারলাম না।" আনুমানিক ছয় থেকে সাত হাজার লোক মারা যায়। আমার বাবা ছাড়াও এক পিসতুতো ভাই শহীদ হন।

আমার বাবার হত্যাকারীদের শাস্তি দাবী করি।



মোঃ নজরুল ইসলাম সরদার
পিতা : মৃত কমর উদ্দিন সরদার
বয়স : ৪০/৪২
পেশা : কৃষি
গ্রাম : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

চুকনগর গণহত্যার দিন (৫ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার) আমি বাজারের সাইডে বল খেলার মাঠে চাউল কিনছিলাম। সেদিন চুকনগরে আশে পাশের হাজার হাজার মানুষ জড় হয়েছিলো। প্রায় প্রতিটি পরিবারের সঙ্গেই ছিল নৌকা, কিন্তু নৌকা নিয়ে তো ভারতে যাবার কোন উপায় নেই তাই বিনা মূল্যেই তারা নৌকা আমাদের কাছে রেখে যাচ্ছিলো। এই শর্তে যে, "আমরা যদি ফিরে আসতে পারি তো তোমাগের কিছু পয়সা কড়ি দিয়ে নৌকা ফিরত নেব।" আর সের পাঁচ সিকি দরে চাউল কিনছিলাম। সকাল দশটা কি সাড়ে দশটার দিকে সাতক্ষীরার দিক থেকে পাক বাহিনীর দুটো গাড়ি এসে, মালতির কাছে ঝাউতলা থেকে গুলি করতে শুরু করে। যে যেদিকে পারে ছুটলো, আমরা বাড়ির দিকে দৌড় দিলাম। আমাদের বাড়ির পূর্ব দিকে ৭/৮ বিঘার একটা পগার আছে, পাড়ার নারী-পুরুষ সবাই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রোদে সেই পগারে আশ্রয় নিলাম। গরমে ছেলে-পেলে কানতে শুরু করলে, কাপড় চোপড় দিয়ে বাতাস করতে থাকলাম। বাতাস করতে গিয়ে পানিতে যে শব্দ হচ্ছিলো তাতেও আমরা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ি। কারণ কোনভাবে যদি পাক বাহিনী চলে আসে তাহলে ৭/৮ হাজার লোক সবাই মারা পড়বে। কারো তো দেখার সাহস নেই কি হচ্ছে? যে কোন মূহূর্তে যে কারো গুলি লাগতে পারে।

এরই মধ্যে রতন নামে আমাদের পাড়ার একজন পাক বাহিনীর সামনে পড়ে যায়। তাকে জিজ্ঞাস করলো "মুসলিম না মালায়োন"। মুসলমান পরিচয় দেবার পর লুঙ্গি খুলে দেখে নিশ্চিত হবার পর বলে "নারায়ে তাকবির" স্লোগান দেবার জন্য। কিছুক্ষণ পর মসজিদ থেকে আযান শুনতে পাচ্ছি। তখন বেলা আনুমানিক সাড়ে বারোটা বাজে। আমরা নিশ্চিত হয়ে ছুটে এলাম, মাথায় টুপি দিয়ে "নারায়ে তাকবির" স্লোগান দিতে থাকলাম। "স্লোগান দিতে লাগলো, ওরা আমাদের বললো যে মুসলিম কোন ধারে, আর মালায়োন কোন ধারে।" না দেখিয়ে দিলে আমাদের মেরে ফেলবে। বাধ্য হয়ে দেখিয়ে দিলাম। তারপর হিন্দু এলাকার দিকে গুলি করে চলে গেল, পাক বাহিনী চলে যাবার পর গিয়ে দেখি চারিদিকে কেবল লাশ আর লাশ। অন্ততঃ দশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়।

আমাদের এলাকায় খাঁ সাহেব নামে এক খান ছিল, চুকনগরের খেয়া ঘাট বাইতো। সে বললো, "তোমরা যদি এই লাশ না ফেল তাহলে তো তোমরাই গন্ধে টিকতে পারবা না। আর আমারে বলি গেছে। লাশ যদি না ফেল তালে তোমাদের কিন্তু কালকে এসে গুলি করে দেবে। ছাড়বে না।" পাক বাহিনী আবার আসতে পারে এই ভয়ে পরদিন ভোর থেকেই নদীতে লাশ ফেলতে শুরু করি। বাঁশে লাশ ঝুলিয়ে নদীতে ফেলতে থাকি। দু'শ পর্যন্ত লাশ গুনেছিলাম এরপর আর গুনিনি। "ফেলায়ে ঠেলায়ে দিয়ে আমরা ঐ লাশের গায়ে ঠায়ে দু'চারটা পয়সা কড়ি যা ছিল, বা আপনার ঐ থাল, বাটি-ঠাটি যেটা পাইলাম আমরা আঠারো জনে, ২৫ টাকা করি ভাগে পাইছিলাম।"

আমার জানামতে আহত বা নিহতদের পরিবার কোন সাহায্য পায়নি। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া উচিত।



সমরেশ মণ্ডল
পিতা : ঈশ্বর কৃষ্ণ লাল মণ্ডল
বয়স : ৪১
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : খড়িবুনিয়া
পোস্ট : কাঞ্চনপুর
থানা : ডুমুরিয়া।

আমাদের বাড়ি খড়িবুনিয়া। বিভিন্ন লোকের অত্যাচারে জর্জরিত ছিলাম। তাই রাতে পালানো অবস্থায় থাকতাম। সে রকম পরিস্থিতিতে আমরা ভারত যাব, তাই মে মাসের পাঁচ তারিখ নৌকা যোগে চুকনগর আসি। নদীর সাইড যেখানে ব্রীজ আছে সেখানে ছিলাম। সবাই একসাথে রওনা দেব তাই দুটো রান্না করে খেয়ে নিচ্ছিলো। আর সেদিনই সকাল দশটা বা সাড়ে দশটার

দিকে গুলি শুরু হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করে। কবুতর বা বক যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করে মারে, সেই রকম করে মানুষ মারে।

এই দেখে লোকজন সব 'বেহুস' হয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। কে কোথায় যাবে, কি করবে। ভাই কোথায়, মা কোথায় বাবাই বা কোথায় কারো যেন খোঁজ নাই। লোকে লোকারণ্য এত লোক, কোথায়ও আর পা দেয়ার জায়গা নেই। সব যে যার মত বাঁচার চেষ্টা করতে থাকলো। আমরা মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সব এক জায়গায় ছিলাম। ঐ দেখে সবাই তখন দৌড় শুরু করে। আমাদের জিনিসপত্র সব একটা বাড়ির একটা সাইডে রাখা ছিল। সবার দৌড় দেখে ঠাকুমা বললো—'গুলি গোল্লা ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে আমাদের পুকুরে যেয়ে পালাতে হবে। "কেউ কেউ বলছে পুকুরে গুলি করছে না। তখন আমরা সেইভাবে দৌড় শুরু করি। বহু মানুষ ঐ ঝাকে ঝাকে দৌড়ে চলছে। কিছুদূর যেয়ে দেখা গেল সামনে পুকুর, পুকুরে ২-৩ হাত পানি। অনেকে পুকুরে নামছে, অনেকে আবার উপরে দাঁড়ানো। আমি পাশের একটা বাঁশ ঝাড়ের ৪-৫ হাত উপরে উঠে দেখছি আর্মি আসছে কিনা। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাথার এক হাত উপর দিয়ে গুলি শো শো করে চলে গেল। আমি সেখান থেকে লাফায়ে পড়ে মাকে বললাম—মা, আমরা আগে যেখানে ছিলাম চলেন সেখানে একটা ঘর আছে, সেই ঘরের ভেতরে যাই। আমি কিন্তু ঘরের ওখানে যাচ্ছি, আপনি সবাইকে নিয়ে আসেন। আমার বাবা কিন্তু জিনিসপত্র-খাদ্য-খাবার নিয়ে সেখানেই ছিল। ঠাকুরমা নিষেধ করে, কিন্তু আমি আর আমার পাশের গ্রামের আর একটা ছেলে দু'জনে মিলে সেখানে যাই। আমরা দৌড়ে সেখানে যেয়ে দেখি সেখানে বাবা নেই, ঘরের ভেতরে ২০-২৫ জন লোক। এদিকে অনর্গল গুলি চলছে। এখন কি করি ঐ ঘরের ভেতরে বসে থাকলাম। থাকার দশ মিনিট পর বাবা সে ঘরে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন 'সমরেশ তোমার মা, ভাই-বোন, পিসিমারা কোথায় গ্যাল।' আমি বললাম তারা আসছে। তোমার কোথায়ও যাবার দরকার নেই, তুমি এই ঘরের ভেতর থাকো। বাবা সেইভাবে চুপচাপ বসে থাকে। আমরা একটা হোগলার পাতার বেড়ার ঘরে ছিলাম, সেখানে কোন দরজাও ছিল না। কিছুক্ষণ পর দেখি তিনটি ভারী ভারী অস্ত্র ঘাড়ে নিয়ে আসছে (পাক আর্মি)। রাইফেল তো তখন চিনতাম না। তিনজনের হাতে তিনটি সিগারেট, টানতে টানতে আসছে। একজন ঘরের উপর দিয়ে ফায়ার করতে লাগলো। আর দুই জন দুই সাইড দিয়ে আসে। এই দেখে আমি বেহুস হয়ে মানে বসা অবস্থায় পড়ে যাই। পরে কি হয় আমি আর কিছু জানি না। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়ি। বাবা আমাকে ডাকলো যে সমরেশ উঠতো। আনুমানিক চারটা সাড়ে চারটার দিকে ঘুম থেকে উঠি গুলি বন্ধ হয়েছে। বাবা যেখানে যায় আমি সেখানে যাই। হাঁটার জায়গা নেই, পথঘাট রক্তে গড়ান যাচ্ছে। আর লোক, আমি সে কথা বলতে পারছি না কি অবস্থা তখন হয়েছিল। রাস্তা-ঘাট, মাঠ বিভিন্ন জায়গায় লোক কেউ জীবিত, কেউ মারা গেছে, কেউ বা আবার বাবারে মারে করে কান্নাকাটি করছে। আনুমানিক ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছরের এক লোক রাস্তার ধারে পড়ে বলছিলো—'বাবা আমাকে একটু জল দাও, আমি আর বাঁচছি না। সেই শুনে আমি বাবাকে জড়াই ধরি কাঁন্দি ছিলাম এবং

বলছিলাম বাবা আমার মা কই, ভাই কই। তখন বাবা হাউ-মাউ কইরা কানতে লাগলো। "কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না তখন সন্ধ্যা হওয়া হওয়া ভাব। এক জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়। রাত্রে এক বাড়িতে আশ্রয় নেই। সেখানে আমাদের গ্রামের আরো লোকজন ছিল। পরে আমরা বাবার ধর্ম ভাইয়ের বাড়ি যাই। সেখানে দশ-পনেরো দিন ছিলাম এবং সেখানে থেকে সবাইকে বিভিন্ন জায়গাতে খুঁজতে লাগলাম। পাগলের মত ঘুরে বেড়াই, যে যেখানে যেতে বলে সেখানে যাই। কোথায়ও আর খোঁজ পাওয়া যায় না। আমি মার জন্যে কাঁদি, বাবাও মাঝে মাঝে কাঁদে। কোথায়ও তাদের খোঁজ না পেয়ে দেশের বাড়ি মানে গ্রামে চলে গেলাম। সেখানে যেয়ে দেখি দুই চার ঘর লোক চুকনগরে গুলি খেয়ে ফিরে এসেছে। এখন আমাদের খুব সতর্ক হয়ে চলতে হয়। দিনেও পাহারা দিয়ে গোপনে থাকি। এখানে কিছুদিন থাকার পর সবাইকে খুঁজে বার করার জন্যে ইন্ডিয়া চলে যাব বলে পুনরায় ধোবী গ্রামে চলে আসলাম। তখন ইন্ডিয়া থেকে সাহপুরের একটা লোক আমাদেরই আত্মীয় নাম সুনীল। সুনীল দার সাথে দেখা হলে সে জানায় মা'রা ইন্ডিয়াতে আছে। বিতারি ক্যাম্পে মা'র সাথে তার দেখা হয়েছে। ২ মাস পরে বিতারি ক্যাম্পে এসে মা'দের খুঁজে পাই এবং জানতে পারি চুকনগরের গুলিতে আমার বড় ভাই মারা গেছেন।

মার কাছে শুনেছি গুলির সময় মা'রা পুকুরে পড়েছিলো। পুকুর লোকে একেবারে ভর্তি ছিল। একটা মাছি পড়ার মতও জায়গা ছিল না। এত লোকের ভীড় ছিল। খান সেনারা ৪-৫ জন পুকুর পাড় ঘিরে দাঁড়ায়ে পুরুষ লোক দেখে গুলি করে মেরেছে। বাচ্চাদের উঠায়ে উঠায়ে দেখাতে হয়েছে সেটা ছেলে না মেয়ে। তারা (আর্মি) বলছিল—মেয়েছেলেকে মারা যাবে না, শুধু পুরুষ ছেলে। সে ছোট হোক বা বড় হোক সবাইকে 'মাইরতি' হবে। আর তা নাহলে ডাইরেকট মেয়েদেরও গুলি করে দেয়। মায়েদের কোলে বাচ্চা ছেলে থাকলে সেই সমস্ত ছেলেদেরকে বেয়নেট দিয়ে 'কুচি কুচি' করে 'মারিছিল'। আমার দাদার (ভাই) বয়স তখন ছিল ১৭-১৮ বছর। সে তখন ছিল আমার সেজ বোনের আঁচলের তলে। দাদা আঁচল দিয়ে ঢাকা ছিল এবং এক সময় সে আঁচলটা ফেলে দেখছিল উপরের উনারা (খান সেনা) আছে কিনা। আর তখনই গুলি করে দেয়। তাদের সাথে স্থানীয় ২-৩ জন লোক ছিল। যাদের স্বামী, বাচ্চা মারা গেছে তারা যেয়ে নাকি পাক সেনাদের প্রতি ঢিল ছুড়ে দিয়েছে, তাদের হাত ধরে, জামা টেনে ধরেছে এবং বলেছে ' এই শালারা আমাদের গুলি দিয়ে যা, আমার স্বামী মারা গেছে, আমার ছেলে মারা গেছে, আমরা বেঁচে থেকে কি করবো।' তখন তাদের (মহিলা) ১-২ জনকে গুলি করে 'মাইরে' দিছে। কিন্তু ওদের (পাক সেনা) একজন বলেছিল যে তোদের মারতে আসি নাই, তোদের গুলি দেয়া যাবে না। সেখান থেকে পরে খান সেনারা হাসতে হাসতে চলে যায়।

মা, দিদি সবাই পুকুরে ডুবে ডুবে দাদার লাশ খুঁজে বার করে। যেখানে হাত দেয়, সেখানেই লাশ। তারা মেয়েছেলে মানুষ ভয়েতে ভীত হয়ে যায়। ১০-১২টা লাশ তোলার পর দাদার লাশ পেয়ে দেখে যে দাদার চোখের এক সাইড দিয়ে গুলি লেগে মাথায় পিছন দিক দিয়ে বার হয়ে চলে গেছে। দাদার এই অবস্থা দেখে মার

কান্না কেউ ধরে রাখতে পারছিলো না। সবারই ঐ রকম অবস্থা হয়। পরে কিছু লোক এসে বলে দ্যাখেন আপনারা কান্নাকাটি করে আর কি করবেন। স্থানীয় লোক শয়তানী করে ওদের (পাক সেনা) এনে এই লোকগুলোকে মেরেছে। আপনারা কিভাবে বাঁচবেন সেই মতো চেষ্টা করেন। এইভাবে আমাদের গ্রামের ও আশে পাশের গ্রামের লোকজনও মা, "ঠাকুরমা ও দিদিকে বুঝাইছে যে তোমরা মেয়েছেলে একলা এখানে থেকে কি করবে, আমাদের সঙ্গে চলো, ইন্ডিয়াতে চলে যেতে হবে।" এখানে থাকলে বয়স্কা মেয়ে ধরে নিয়ে যেতে পারে। কাউকে না পেয়ে আমার মারা ইন্ডিয়া চলে যায়। ছ'মাস পর আমরা ঐ সংবাদ পেয়ে ইন্ডিয়া যাই।

চুকনগরের ঘটনায় আমাদের গ্রামেরই ৫-৭ জন লোক মারা যায়। আমাদের মধ্যে ছিল দাদা, বাবার মামা, আমার মামা, পিশি মশাই এবং আরো কিন্তু আত্মীয়-স্বজন। আনুমানিক পাঁচ-ছয় হাজারের মত লোক সেখানে মারা যায়। আমার নিজের চোখেই ৫-৭ জন মেয়েছেলে এবং ৮-১০ জন বাচ্চার লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। সেখানকার বেশ কিছু মুসলমান লাশ সব টেনে টেনে নদীতে ফেলে দেয়। মাঠ-ঘাট সব রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো। নদীর জল সব একেবারে রক্তে লাল হয়ে যায়। তা আর চোখে দেখা যায় না। নদীতে এত লোকের লাশ ছিল যে লাশের উপর দিয়ে 'হাইটে' পার হওয়া যেতো। আমার ভাই, আত্মীয় এবং নিরীহ যে সমস্ত লোকজনকে যারা মেরে ফেলেছে তাদের উপযুক্ত বিচার আমি চাই।



সরস্বতী মণ্ডল
বয়স : ৫০
পেশা : গৃহিনী
গ্রাম : আলদিপুর
ইউনিয়ন : মাগুরাখালি।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই রাজাকাররা বিভিন্ন গৃহস্থালী সামগ্রী, গরু, ছাগল নিয়ে যেতে থাকে। বৈশাখ মাসের শেষ দিকে রাজাকাররা ধরে ধরে জবাই করতে শুরু করে। আমাদের গ্রামের খোকন মিয়া ইউসুফ মিয়া সহ সর্দার বাড়ির বাবুদের খুন করে। এই ঘটনার তিন দিন পরে পালিয়ে ভারতে যাবার উদ্দেশ্যে পরিবারের সবাই জ্যৈষ্ঠ মাসের চার তারিখে চুকনগরে যাবার জন্য রওনা হই। পরের দিন সকালে ১০টার দিকে চুকনগরে পৌঁছাই।

কেউ মালপত্র নামিয়ে রাখছে, কেউ একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। এই ফাঁকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেবার আগে কিছু একটা মুখে দিয়ে নিচ্ছে। এমন সময় দেখলাম পাকা রাস্তা ধরে মিলিটারীর গাড়ি এসে থামলো। দশ/বার জন খানসেনা রাইফেল

হাতে লাফিয়ে নামলো। নেমেই গুলি করা শুরু করলো। "পালাইয়া যাতি লাগলি মানে আইসে গুলি করে মারতি লাগলো। আমাগো সামনি ধরি ধরি লাইনে দিতে লাগলো। লাইনে দিয়ে দিয়ে গুলি করতি। গুলি করে মারতি লাগলো। আমাদের তো কোলে বাচ্চা টাচ্চা ছিল। ছোট বাচ্চা। আমার একটা মেয়ে ছিল পাঁচ মাস বয়সের। সেই মেয়ে নিয়ে পুটিয়ারির খালে পড়ি ডুবাডুবি করতে লাগলাম।" এভাবে বহুকষ্টে নিজের জীবন রক্ষা করলাম। গোলাগুলি বন্ধ হলে জানলাম আমার স্বামী, শ্বশুড়কে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। আমার মনে হয় আট/নয় হাজার মানুষকে সে দিন হত্যা করা হয়। কারণ যে দিকে তাকাই কেবল লাশ দেখেছি, এই বিশাল প্রান্তর লাশ আর রক্তে পূর্ণ ছিল। মহিলা, তরুণীদের পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। অনেককে লাঞ্ছিত করে। এই ঘটনার পর যারা বেঁচে ছিল ভারতে চলে যায়। আমি আর যেতে পারিনি। কারণ আমার তো আর কেউ ছিল না। "আমার এত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে আমার স্বামী, আমার শ্বশুড়, আমার ছেলে আমি এর প্রতিশোধ কেউ কোন দিন না 'চাইয়ে' পারে। জীবনটাই বৃথা হয়ে গেল দুনিয়ায় আসিয়া।"



মিনা গাইন
পিতা : অবিনাশ গাইন
বয়স : ৪০
পেশা : গৃহকাজ
গ্রাম : বটিয়াঘাটা
থানা : চুকনগর।

২০ মে ১৯৭১, সময়টা আমার মনে নেই। গুলির শব্দ শুনে নৌকো নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা করে চুকনগর পৌঁছি। জলমা, বটিয়াঘাটা এলাকা ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোকজন চুকনগর বাজারে জড়ো হচ্ছিলো। উদ্দেশ্য বর্ডার ক্রস করে ভারতে যাওয়া।

চুকনগর বাজারেরই এক দোকানের বারান্দায় বসে আছি ভাই-বোনদের নিয়ে। মা চুলোয় রান্না চড়িয়েছে, এমনি সময় গাড়ির শব্দ শোনা গেল। আমরা সব ছুটোছুটি করছিলাম বলে বাবা আমাদের এক জায়গায় বসিয়ে রেখেছিলো। তিনি এক গ্লাস পানি খেয়ে শেষ না করতেই খান সেনারা তার নাকের ছিদ্র দিয়ে গুলি করে। "আমার বাবা তখন আমার দিক তাকায়ে শুধু মা বলে একটা করুণ আর্তনাদ করে ওঠে।" মা রান্না ফেলে দৌড়ে এসে পাষাণমূর্তির মত বাবার রক্ত মাখা দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ফিনকি দিয়ে বাবার মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে। আমরা তিন ভাই-বোন বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম বলে আমাদের শরীরও রক্তে ভরে যায়।

পরবর্তীতে মনি কাকুকে গুলি করতে গেলে আমি তাদের পা জড়িয়ে ধরি। "দেখেন আমার বাবাকে তো মারিছেন, আমরা সবাই ছোট ছোট, আমরা কোথায় দাড়াবো? আমার কাকুকে মারবেন না।" তখন তারা আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কাকুকে গুলি করে। তার ছেলে সেখানে বসা ছিল, তাকেও গুলি করে। আমি সে সময় ছোট হলেও এ ঘটনায় মনে প্রতিশোধের ইচ্ছা তীব্র হয়। খেঁজুরের কাঁটা খুঁজছিলাম, "ওদের চোখে ঢুকিয়ে অন্তত একটু যন্ত্রণা দিতে পারি কিনা? বাবার কথা মনে হলে এখনও আমার প্রতিশোধের আগুন জ্বলে। যারা এই নির্মম হত্যাযজ্ঞ চোখের সামনে দেখেছে তাদের কাছে এটা সহ্য করা কত কঠিন, কত যন্ত্রণাদায়ক তা ভাষা দিয়ে বুঝাতে পারবো না। এখনও আমার বাবার ঐ করুণ আর্তনাদ, মা বলে ডাক, ঐ মুহূর্তটা মনে হলে গায়ের রক্ত গরম করে তোলে।"

সেজদা বেঁচে থাকায় তিনি তখন দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের সবাইকে নিয়ে ভারতে চলে যায়। অন্য দাদারা পূর্বেই ভারতে চলে গিয়েছিলো বলে তারা সেখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়।

এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী তাদের অবশ্যই বিচার হওয়া দরকার। "যদি বাবার হত্যাকারীর খোঁজ পাই, গুলি করে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাই। কিন্তু কোথায় পাবেন সেই অত্যাচারী খান সেনা? নর পশুদের?"



আয়নামতি গোলদার
পিতা : নারায়ণ গোলদার
বয়স : ৪০/৫০
পেশা : অন্যের বাড়ি কাজ
গ্রাম : খড়িবুনিয়া
থানা : ডুমুরিয়া।

একাত্তর সালে কি করবো ঘর-গৃহস্থালী করতাম, সংসার করতাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচ তারিখ বিষ্যুদবার দিন চুকনগর যাওয়া হলো। সকালে চুকনগর যেয়ে নৌকা থেকে বেড্রিং পত্র নামালাম। সেখানে জিনিসপত্র নামায়ে এক বাড়ি থেকে 'নড়ি-ঘড়ি' এনে চুলা ধরায়ে রাত্রে একটু খাওয়ার মত ব্যবস্থা করি। "ঐ চুকনগরে মিয়া বেডারা কয়— 'বিডিরা এপাশ থে তোমরা বেডিংপত্র থুইয়ে এখান থে নইড়ো না। কালকে যারা আইলো তারা ঐ লুটপাট করে নিইলো। আমাদের চেয়ারম্যান বাড়ি লুটপাট করতেছে।' তাই বলে আমাদের সান্তনা দিতে লাগলো। সকাল বেলা ও (স্বামী) বলছে যে 'চিড়ে-টিরে যা আনা হয়েছে এখন খাওয়া যাবে না থাক্ পথে যেয়ে কি করবে নে। এখন পাক-শাক করে খাইয়ে নাও।" পাক করে খাবার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে গুলি আরম্ভ হয়ে গেল।

"সব পলাইল। কেউ পার হইলো, কেউ মারা গেল। যারা 'পলাপলি' করলো তারা সব মারা গেল।" আমার স্বামী, আমরা সকলে এক জায়গায়, আরো মেলা মানুষ ছিল। সেইখানে গুলি কইরে দিল! "ছেলেদের ক'লো এই তোর বাবা কিডা। আমি পা জড়ায়ে দরলাম যে বাবা মাইরো না। তা ক'লো হ্যাট—এইডা তোর বাবা। তাই কইয়ে ঐ টেমিগান টাইনা দিল। গুলি এখানে লাগিল সেখানে লাগিল। তা ধরফরাইয়া আমার স্বামী মইরা গেল।"

ওরা (আর্মি) চারজন এসেছিল। চুকনগরের মিয়ারা তাদের ডেকে এনেছিলো। তারা আগে আগে যেয়ে যারা বাগানে বা এখানে সেখানে পালিয়েছিলো "তাদের দেখিয়া দিলে খানেরা ওমনি 'কটকট' করে গুলি করে দেয়। প্রথম দিকে মেয়েদেরও মারে। পরে শুধু পুরুষ লোক বেছে মেরেছিল। টেমিগান এমনভাবে ধরে টান দিয়া ধরে আর এই চারটা-পাঁচটা আইসে পড়লো আর মারা গেল। মেলাজন মারিলো। অত ঠিক ধরে আমি বলতে পারিনে। মারা শেষ হইলে ওরা (সেনারা) 'টেরাকে' উঠি চলে যায়।" আমরা সব পাগলের মত হয়ে যাই। রাস্তার উপর দৌড়ায়ে কান্না-কাটি করে অজ্ঞান অবস্থায় এক কড়ি রক্তের মধ্যে পরেছিলাম। আমার দুইটা ছেলে, তিনটা মেয়ে সব কান্নাকাটি করছিলো। "খাওয়ার জ্বালায় হা হা করতেছিল।" বেলা নাই তখন কি করবো, কোথায় যাব, কি খাব, যাবার কোন পথ দেখি না। এই শুকনো পথে কোনদিন আসি নাই, কোন কিছু চিনি না। যার সাথে আসলাম সে ফেলায়ে চলে গের। কার সাথে যাব, দেশে যাব না ইন্ডিয়া যাবো। পরে আমার এক দেওর এসে আমাদের দেশে নিয়ে যায়। দেশে যেয়ে ভয়েতে এক মাস পালিয়ে পালিয়ে থেকেছি। আজ এখানে গুলি হয়, কাল সেখানে গুলি হয়। 'যে দিন জয় বাংলা জোয়ার উইঠে গেইল সে দিন মনে বাঁচলাম।' দেশে ফিরে এসে ঐ ভিক্ষা করে "খাইয়েছি মেইয়া-পোলা নিয়া আমি ঐ কষ্টের কথা কারো 'কইয়ার' পারি নাই।" এ হত্যাকাণ্ডের বিচার তো চাই!



চাঁদরানী দাস
পিতা : বাবুলাল দাস
বয়স : ৪০
পেশা : দিনমজুর
থানা : ডুমুরিয়া।

আমি তখন ছোট। চুকনগরের কাছেই আমাদের বাড়ি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আসার খবর পেয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্যত্র চলে যাই। ভাই আমাদের সাথে না এসে জিনিসপত্র ঠিকমত গুছিয়ে পরে আসবে বলে বাড়িতে থেকে যায়। পাক সেনারা তখন পাড়ার ভেতর ঢুকে গুলি শুরু করে দিয়েছে।

ভাইকে গুলি করার সময় সে তাদের "জরাইয়ে ধইরে কইয়েচে যে, আমি মা'র এক ছেলে আমারে মেরিনা, তাই আমার মা জ্যান্ত থাকপে না। বইলেছে আমি মুসলমান। কয় কাপড় উঠা। কাপড় উঠোলে অমনি গুলি করলে।"

রাস্তায় জল, প্যান্ট ওদের হাটু পর্যন্ত গোটানো। (জ্যৈষ্ঠ মাস, বৃহস্পতিবার) এ অবস্থায় ওরা গুলি করছিলো। লোকজন সব নদীতে পড়ছিলো, কেউ আহত, কেউ মৃত অবস্থায়। তাছাড়া সাথে মহিলা থাকলেও তাদেরকে রেখে পুরুষদের ওপর গুলি করেছে বেশি। সে সময় চতুর্দিক থেকে কান্নার শব্দ, চিৎকার চেঁচামেচি সে এক করুণ দৃশ্য!

গোলাগুলি শেষ হবার পর আমরা বাড়ি চলে আসি। দেখি ভাই মরে পড়ে আছে। মাথার দিকে একটা পানির কলস পড়ে আছে। কেউ হয়তো শেষবারের মত জল মুখে দিয়ে দেখেছে বেঁচে আছে কিনা? আমরা তখন ভাইয়ের লাশ তুলে নিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেই।

যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে ভাইয়ের শোকে শোকে বাবা মারা যায়। পরবর্তীতে মাও মারা যায়। বাবার দেয়া পৈতৃক ভিটেটুকু আমার সম্বল ছিল। সেটাও জোর করে কেড়ে নেয়া হয়। এখন আমি পথের ভিখিরী। "আমার এই যে ক্ষয়ক্ষতি অইয়ে গ্যাছে, জীবনতো আর পাবো না, তবু তাদের হত্যাকারীদের এ্যাট্টু বিচার চাই।"



পুর্নেন্দু গাইন
পিতা : অবিনাশ চন্দ্র গাইন
বয়স : ৩৮
পেশা : শিক্ষকতা (খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়)
গ্রাম : বটিয়াঘাটা
থানা : ডুমুরিয়া।

আমি চুকনগর গণহত্যার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং তার প্রত্যক্ষদর্শী। ঐ সময় আমি খুবই ছোট, আট বছর বয়স, ক্লাস ওয়ান-এর ছাত্র। গণহত্যার তারিখটা ইংরেজিতে ২০ মে, ১৯৭১ সাল ছিল।

আমরা পাক হানাদারদের তাড়া খেয়ে ইন্ডিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯ মে বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে রাতের বেলা চুকনগর এসে পৌঁছাই। আমাদের পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরাও একসাথে অবস্থায় ছিলাম। ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ২০ মে সকাল বেলাতে আমরা প্রস্তুতি নিতে থাকি। যানবাহন খোঁজার চেষ্টা ভোর থেকেই শুরু হয়েছিলো। আমার বাবা, কাকা গার্জিয়ান পক্ষীয় যারা ছিলেন ওনারা বললেন যে আমরা এখান থেকে খানাদানা করে একটু আস্তে ধীরে

রওনা দিবো। তখন সকাল ৮টা বাজে, আমরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছি। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে আমি একটা ঘটিতে করে চুকনগর বাজারের টিউবওয়েল থেকে পানি আনতে গিয়েছি। ঘটায় পানি অর্ধেকটা ভরেছি এই রকম সময় হঠাৎ করে গুলির শব্দ শুনি। শুনে ঐ ঘটি ঐখানে ফেলে আমি আমার আত্মীয়-স্বজন যেখানে ছিল সেখানে ফিরে আসার চেষ্টা করি। ফিরে আসার পথে দেখি মানুষ ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করছে। কি ব্যাপার? এই দিকে গুলির শব্দ, ঐ দিকে মানুষের ছুটাছুটি। আমি ছুটে বাবার কাছে এলাম। সবাই তখন বিভ্রান্ত মানুষজন যে যেদিকে পারে ছোটাছুটি করছে। কিছু লোক আমাদের এসে অভয় দিল যে চেয়ারম্যানের বাড়ি লুট হচ্ছে। আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনারা যে যেখানে আছেন সুস্থভাবে থাকেন। আপনাদের কোন ভয় নেই। আপনাদের কেউ কিছু বলবে না। এখন আমি মূল্যায়ন করি এভাবে যে ঐ সময় যারা আমাদের অভয় দিচ্ছিলো প্রকৃতপক্ষে তারা চাইছিলো আমরা ওখানে বসে থাকি এবং আমাদের পাকিস্তানীরা মেরে যাওয়ার পর আমাদের যে সম্পত্তি, টাকা পয়সা, সোনা-দানা যা ছিলো ঐগুলি হস্তগত করা। বিভ্রান্ত লোকজন চুকনগর বাজারের পাশে একটা নদী ছিল সেখানে যেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছে। কেউ যেয়ে গাব গাছের ঝোপের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করছে। তখন আমাদের পরিবার আমরা কি করবো, আমার পিতা বললেন যে এই মুহূর্তে ছুটাছুটি করে কোন লাভ নেই, মেয়েছেলেদের নিয়ে কোথায় যাব, তার চেয়ে আমরা চুকনগর কালিবাড়িতে বসে থাকি। আমরা যেহেতু হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী সেহেতু কালিবাড়ি বারান্দায় বসে থেকে দেখি ভগবান আমাদের রক্ষা করে কি না বা আমরা বাঁচতে পারি কি না। ওনার সেই আত্মবিশ্বাস আমরা সবাই ঐ কালিবাড়ির বারান্দার উপরে বসে পড়লাম। আমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং শরীকের মধ্যে যারা একটু বড় তারা ওখান থেকে ছুটাছুটি করে কেউ নদীতে পড়লো, কেউ বা নদী সাঁতরায়ে ওপরে উঠলো। কেউ নৌকায় যেয়ে আশ্রয় নিলো। আমাদের কাছে যে টাকা পয়সা এবং সোনাদানা অলংকারাদি ছিল আমার এক ভাইয়ের কাছে দেয়া হলো। পরবর্তীতে শুনেছি যে ঐগুলো নিয়ে সে একটা বটগাছের নিচে আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে ছিল। সম্ভবত ওনাকে সেখানে হত্যা করা হয়েছিলো। গণহত্যার পর তাকে আর আমরা খুঁজে পাই নি।

আমরা কালিবাড়ি বসা থাকা অবস্থায় কি করবো, কোথায় যাব এ সব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি হঠাৎ করে দেখলাম ৪/৫ জন পাকিস্তানী আর্মি এবং তাদের সাথে আরো ৪/৫ জন রাজাকার। তারা সব ৮-১০ জনের মত হবে। আমরা যে বারান্দায় বসেছিলাম তার সামনে এসে হাজির হলো এবং গুলি করা শুরু করলো। এখানে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম সক্ষম পুরুষ ১৫-৬০ বছরের মাঝে যে সমস্ত মানুষগুলো তাদের ওরা মারতে চাইছিলো। বৃদ্ধ যারা ছিল তাদের কোলে যদি ছোট বাচ্চা বা অন্য কেউ আশ্রয় নিয়ে ছিলো তাদেরকে ঐখান থেকে ছুঁড়ে ফেলে তাদের মেরেছিলো। আমার চোখের সামনেই বারান্দায় বসে থাকা আমার বাবা, কাকা, কাকার বড় ছেলে, বাড়ির এক জেঠাতো ভাই, জেঠাতো ভাইয়ের ছেলে, আমার পিসে মশাই এবং পিসে মশাইয়ের ছেলেকে গুলি করে মারলো। ওদের গুলি করার পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমি আমার বাবার কোলের পাশে

বসা ছিলাম, আর আমার ছোট বোন বাবার কোলে বসা ছিল। বাবাকে গুলি করেছিলো একেবারে বুকের মাঝখানে। আমার বোন যদি তার মাথাটা এক ইঞ্চি উপরে উঠাতো তাহলে এক গুলিতে মেয়ে-বাবা দু'জনেই নিহত হতো। বোন ভাগ্যের গুণেই হোক আর যেভাবেই হোক বেঁচে গেছে। বাবার বুকের রক্ত ছুটে এসে আমার সমস্ত গা ভরে গেছিলো এবং হঠাৎ করে তখন কেউ দেখলে মনে করতো আমাকেও গুলি করেছে। আমার সচেতনতা এলে চোখ খুলে দেখি যে মা ঘটিতে করে পানি নিয়ে আসছে। ঐখানে যারা মারা গেছিলো তাদের প্রত্যেকের মুখে একটু একটু করে জল দিলেন।

আমরা ওখান থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের যা হারানোর সব তো হারিয়ে গেছে আমরা আর ইন্ডিয়াতে পালাতে যাবো না। পূর্বদিকে নদীর পার বেয়ে আমরা যখন হাঁটছি তখন চরের উপরে দেখলাম যে হাজার হাজার মানুষের লাশ পড়ে আছে। অনেক হৃদয় বিদারক ঘটনাও দেখা যায় যে মা মরে পড়ে আছে এক দেড় বছরের শিশু মার বুকের দুধ পান করছে। তখন ছিল ভাটা, একটু পরে হয়তো জোয়ারের পানিতে সেই শিশুগুলো ভেসে যাবে। শিশুগুলোকে রক্ষা করার মতো মানুষ সেখানে ছিল না। আর আমাদের তো ঐ ধরনের চিন্তা ভাবনার কোন অবকাশ ছিল না। কারণ আমাদের তো তার থেকে আরো বড় ঘটনা ঘটে গেছে।

চুকনগর থেকে পূর্বদিকে কিছু পথ চর দিয়ে হেঁটে যেয়ে আমরা একটা নৌকায় ওঠার চেষ্টা করলাম। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে আমরা চুকনগর পৌঁছেছিলাম প্রায় ১০টা নৌকা নিয়ে। কিন্তু তার একটাও আমরা আর পাই নি। কখনো বাগানের উপর দিয়ে কখনো চরের উপর দিয়ে আসার পথে একটা বড় গাব গাছের নিচে দেখি এক থেকে দুশো মানুষের লাশ। মানুষ পালানোর জন্য ঐ গাব গাছে আশ্রয় নিয়েছিলো আর পাখি মারার মত ওদের গুলি করে মেরেছে। লাশগুলো সব নিচে পড়ে আছে। ৩ কিলোমিটার পথ আসার পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে নদীর পাড়ে বসে থেকে দেখলাম একটা বড় নৌকা যাচ্ছে। সেই নৌকাকে আমরা ডাকলাম এবং বললাম যে ভাই আমরা বটিয়াঘাটাতে যাব আমাদের সব শেষ। আমাদের নিয়ে পূর্ব দিকে নৌকা চালানো শুরু করে।

আমাদের পরিবারের মধ্যে একটু বোঝে এবং একমাত্র পুরুষ ছেলে ছিল আমার সেজ ভাই। এক কিলোমিটার পথ আসার পর ভাই চিন্তা করলেন যে এতোগুলো লোক নিয়ে আমি কি করবো, কোথায় যাব, এদের কি খাওয়াবো। এই কথা চিন্তা করে টাকার জন্য ভাই আবার মৃত লাশ যেখানে আমাদের পরিবারের সবাই পড়ে ছিল সেখানে যায়। সেই রাজাকাররা এর আগেই সব লুটে-পুটে নিয়ে গেছে। তখন আমার এক ভাইপোর প্যান্টের পকেটে কিছু টাকা পান। ঐ টাকা দিয়েই আমরা নৌকা ভাড়া করি। তখন আমাদের অবস্থা এরকম যে আমাদের দলে ২০-৩০ জন মেয়েছেলে আর ১৫-২০ জন ছোট শিশু। আমার মা-চাচীরা, বাড়ির বৌ-ঝিরা আর বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে ঐখান থেকে ঐ নৌকায় চড়ে কিছুদূর এলে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যার সময় আমরা এক বাড়িতে আশ্রয় নেই। তারা যথেষ্ট আপ্যায়ন করলেন। আমরা আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ইন্ডিয়া যাব পরে চিন্তা করলাম যে আমাদের কিছু আত্মীয়-স্বজন তারা আগেই সেখানে চলে গেছে এবং

তারা যদি আমাদের কথা শুনে ফিরে আসতে চায় তবে মারা পড়বে। তখন আমাদের চিন্তা ভাবনা ঘুরিয়ে বাড়ি যাওয়ার পরিবর্তে ইন্ডিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্তে দক্ষিণ দিকে রওনা দেই এবং সাতক্ষীরার নিচু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আমরা ইন্ডিয়া যাই। রাজাকার, দালাল, আল-বদর যারা ছিল তারা এবং পাক হানাদার বাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় চুকনগরের গণহত্যাটা হয়েছিলো। যশোর থেকে আর্মিরা এসে ২/৩টি গ্রুপে ভাগ হয়ে যায়। তাদের সাথে স্থানীয় সিভিল মানুষ ছিল আর্মিরা তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। চুকনগর বাজারের বটগাছের চারিপাশে যে ঘরগুলিতে মানুষ ছিল তাদের ৭/৮ ফুট দূর থেকে গুলি করেছিলো। আমার এক ভাইপোকে যখন গুলি করেছিলো তখন আমার এক জেঠাই মা ঝাঁপ দিয়ে যেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলে এক গুলিতে দু'জনকেই মেরে দিয়েছে। বারান্দায় বসা আমার পরিবারের ৮ জনকে মারতে ওদের পাঁচ মিনিটের মত সময় লেগেছিলো। তারা অটোমেটিক মেশিন গান, এস. এল. আর, এস. এম. জি এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছে। দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষের লাশ আমি দেখেছি। যেখানে বসেছিলাম সেখানে ৫০/৬০ জনের লাশ এবং নদীর চরের ১ থেকে ২ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে হাজার খানেক লাশ পড়েছিলো। গাব গাছের নিচে পড়ে থাকা লাশগুলো মিলালে দুই আড়াই বা তিন হাজার লোকের কম হবে না। দৌড়াদৌড়ির সময় মানুষের পাড়া খেয়ে, আবার নদী পার হতে যেয়েও অনেক লোক মারা গেছে।

বাংলাদেশের অনেক বধ্যভূমি, চিহ্নিত হচ্ছে এবং অনেক বধ্যভূমি নিয়ে আজকে সারাদেশ জুড়ে হৈ চৈ হয়। কিন্তু আমার যেটা ধারণা যে চুকনগরে যে গণহত্যা হয়েছিলো এত বৃহৎ গণহত্যা বাংলাদেশের আর কোথায়ও ঘটে নাই। এ ঘটনাকে যেভাবে তুলে ধরার কথা কেউ সেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হয় নাই।



এস. এম. আতিয়ার রহমান
পিতা : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান শেখ
বয়স : ৩৮
পেশা : চাকুরি (খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়)
গ্রাম : মেছাগোনা
থানা : ডুমুরিয়া।

আমার খুব মনে আছে তখন আমি ক্লাস থ্রি-ফোরে পড়ি। বয়স আট কি নয় হবে। সে সময় পুরো এলাকার পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক, হতাশাব্যঞ্জক। শুনতাম যে অমুক জায়গায় সেনাবাহিনী আক্রমণ করেছে, অমুক জায়গায় রাজাকাররা এট্যাক করেছে। বিভিন্ন জায়গায় লোক মরে পড়ে আছে। কোন নিরাপত্তা ছিল না। খবর শোনার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন থাকতাম। পাকিস্তানী সেনা এবং রাজাকারদের অত্যাচার ও মারামারি

বেড়ে গেলে হাজার হাজার মানুষ প্রাণের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছিলো। সোজা, তাড়াতাড়ি, সর্টকাটে যাবার জন্য কেশবপুরের ভেতর দিয়ে বর্ডারটা খুব কাছাকাছি, মুক্তিবাহিনী এবং যুবকরা যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তারা তাদের গাইড করে নিয়ে বর্ডার পার করে দিচ্ছিলো। আমাদের বাড়ির সামনে হচ্ছে খুলনা-সাতক্ষীরা সড়ক। এখন যে সড়কটা পাকা। এই সড়ক তখন কাঁচা ছিল। ইট বসানোও ছিল না। চুকনগর হত্যার একদিন আগের ঘটনা ১৯ মে, বুধ বা বৃহস্পতিবার সেদিন খুলনা অঞ্চলের বিশেষ করে বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রায় ৮-১০ হাজার লোক বাচ্চা-শিশু, নারী ও অন্যান্য দলগুলো আমাদের এখানে এসে তারা দুপুরের খাবার খায়। আমি এবং আমার বাড়ির আরো কয়েকটি ছেলে আমরা আমাদের ক্ষেত থেকে 'ঝাল' (মরিচ), বেগুন, ঘর থেকে চাউল 'ধামায়' করে নিয়ে যেভাবে পারছিলাম সরবরাহ করছিলাম। খাবারের জন্য বাচ্চারা কাঁদছিলো, অনেকে না খেয়ে বুভুক্ষ ছিল। আমরা ঐ দুপুরে আরো দেখলাম যে নক্শাল যারা ছিল এই অঞ্চলে তারা কয়েকজন রাইফেল নিয়ে সবাইকে বলছে যে 'আপনারা যাবেন না, আপনারা থাকেন। আমরা ওদেরকে (আর্মি, রাজাকার) প্রতিরোধ করবো।' আমি ঐ সময় প্রথম নক্শাল দেখি। আমার গ্রামের যারা বয়স্ক তারা ভয়তে পালিয়েছিল। কিন্তু আমরা বিশেষ করে যারা এই ছোট বয়সের তারা 'উৎসুক' হিসেবে তাদের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলাম। তাদের যাত্রার যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, অমানবিক যে বিষয় সেটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। চুকনগরের আগে দুটো নদী আছে হামকুড়া ও ঘর্নিয়া। হামকুড়া নদী দিয়ে তাদেরকে আমাদের ছোট নৌকা দিয়ে পার করে দিয়েছিলাম। আমাদের থেকে চুকনগরের দূরত্ব ২-৩ মাইল।

পরের দিন বিকেলের ঘটনা শুনলাম, আমরা যাদেরকে খাইয়ে পার করে দিয়েছিলাম তাদের সবাইকে পাক বাহিনী হত্যা করেছে। সেটা শুনে তো আমার কিশোর মনে দারুণ রেখাপাত করেছিলো। পরের দিন অভিভাবকদের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তা প্রত্যক্ষ করার জন্য নদীর পাড় পর্যন্ত গিয়ে সেখানে অনেককে কান্নাকাটি করতে দেখি। কেউ কাঁদতে, কাঁদতে আসছে, কেউ লাশ নিয়ে ফিরছে, কেউ বা আবার প্রাণ ভয়ে জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আত্মীয়স্বজন এসে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ভয়েতে আর ঐদিকে যাইনি। আমরা পরে যতটুকু শুনেছিলাম যে ওখান থেকে রাজাকারদের কেউ অথবা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের কেউ সেনাবাহিনীকে এই খবর দেয় যে এখানে বহু দুশমন আছে, বহু লোক দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই খবর শুনেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী গাড়ি নিয়ে এসে এ গণহত্যা চালায়। রাজাকার, আলবদর বা দেশীয় কোন সাহায্যকারী দোসর অবশ্যই তাদের পথ-ঘাট চিনিয়ে নিয়ে এসেছিলো, অন্যথায় তাদের পক্ষে এ সমস্ত পথ-ঘাট চেনা সম্ভব ছিল না। ৮-১০ হাজার লোক যারা আমাদের ওখানে হলট করেছিলো পরবর্তীতে সেই লোকদের উপরই তারা ৪-৫ ঘণ্টা ব্রাশ ফায়ার করে, গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড চালায় বলে লোক মুখে শোনা যায়। তারা নির্বিচারে হত্যা করেছে। কোন বাচ্চা শিশু বা মা কে শত্রু কে মিত্র তা দেখারও কোন প্রশ্নই ওঠে নাই। তারা অন্ধের মত, হিংস্র পশুর মত সবাইকে ব্রাশ ফায়ারিং করে বা রাইফেলের গুলি চালায়ে,

বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে মেরেছে বলে। যারা দেশ ত্যাগ করে যাচ্ছিলো তাদের ৮০% লোক নিহত হয়েছে। আমি যদ্দুর জানি বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, ফকিরহাট, বাগেরহাট এই অঞ্চলেরই লোক বেশি ছিল।



শ্রী অশোক মল্লিক
পিতা : বিশ্বাস ভাজন মল্লিক
বয়স : ৩৬
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : পূর্বপাতিবুনিয়া, ১৪ নম্বর ইউনিয়ন
থানা : ডুমুরিয়া।

তখন আমার বয়স ১২ বছর। বাবা আমাদের নৌকায় করে চুকনগর নিয়ে আসে। আমার অল্প অল্প মনে পড়ে মা রান্না করছিলো, পাকিস্তানীরা গাড়ি দিয়ে এসেছিলো। কোন্ জায়গায় নেমেছিলো সেটা বলতে পারবো না। নামার পর উড়ো ফায়ার করলো। ফায়ার করার পর বললো যে তোমাদের ভয় নাই। "আস্তে আস্তে লোক শান্ত কইরে তাদের মাইরে ফেললো।" ৭-৮ হাজার লোক সেখানে মারা যায়।

খানেরা ২০-৩০ জনের মত ছিল। বাবাকে লাইনে দাড় করালো। যখন দাঁড় করালো তখন বাবা আমাকে মার হাতে দিয়ে বললো যে—"বাচ্চা কডা দেখ, আমি যাচ্ছি।" আমার হাত থেকে এনে বাবাকে গুলি করলো। আমরা ছিলাম সাত ভাইবোন। মা খুব কান্নাকাটি করতে করতে আমাদের গ্রামের আরো লোকজনের সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ি নিয়ে গেল। বাড়ি আসার পর আমার বড় ভাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেল। সে যে পরে দেশের কোন্ জায়গায় চলে গেল আমরা তাকে আর খুঁজেই পেলাম না। তারপর আমার বোন মারা যায়। মা আমাদের লোকের হাতে পায়ে ধরে ভিক্ষে-টিক্ষে করে খাইয়ে ছিল। আমরা এখন ২ ভাইবোন আছি। মা মাথা খারাপের মতন আছে।



ভবেন্দ্রনাথ বালা
পিতা : মৃত ঠাকুরদাস বালা
বয়স : ৩৫
পেশা : ব্যবসা
গ্রাম : পূর্ব পাতিবুনিয়া
ইউনিয়ন : ১৪ নম্বর মাগুরখালী
ডাকঘর : শিবনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

'৭১ সালে আমি খুব ছোট, গণহত্যার সময় বাবার কোলে ছিলাম। বাবাকে খান সেনারা তার বাঁ দিকে গুলি করে এবং তখুনি তিনি মারা যান। পরে আমার ঠাকুর মা ও আমার মা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে নিয়ে যায়। "এমন সময় আমার বাড়ির সাইডে, সম্পর্কে আমার দাদু হয়, সে চিৎকার করে কাঁইদা ওঠে আমার ঠাকুর মা'কে বলে, মেঝ বৌ আমার পেটের ভিতরে নাড়িভুড়ি বের হয়ে গেছে। ওরা আমাকে বেয়নেট দিয়ে পেট কেটে দিছে। তুমি শুধু আমার পেটের ভিতর নাড়িগুলো ঢুকাইয়া দেও, আমি হয়তো বেঁচে যাব। তখন আমার ঠাকুর মা কাঁদতে থাকে। এক পর্যায়ে উনি নিস্তেজ হয়ে গেলেন। তখন আমরা আস্তে আস্তে চলে যাই এই জায়গা থেকে।" ওপরের ঘটনাটা আমার এক দাদুর কাছে শোনা।

সে সময় সবচেয়ে সাহসী ছিল সর্দাররা [এলাকার সর্দার]। ১৯৭১ সালের ১৮/১৯ তারিখে এসব সর্দারদের খান সেনারা মেরে ফেললো। এই ঘটনার পর এলাকার লোকজন জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তা করে। তখনই এক পর্যায়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা এখানে হত্যাকাণ্ডটি চালায়। সেদিন এখানে বহু লোককে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করেছিল। মাগুরখালী ইউনিয়নে সেদিন শিশু, বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ মিলিয়ে অনেককে তারা মেরেছিল। তাছাড়া যারা গুলিতে মারা যায়নি তাদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়েছিল।

পাকিস্তানীরা আমার বাবা-দাদা,জ্যাঠামশাইকে যেভাবে হত্যা করেছিল এবং চুকনগরে বধ্যভূমিতে যারা নিহত হয়েছিলো এবং যারা এর ভিতর জড়িত ছিল, বাংলাদেশে যারা আলবদর এবং আলশামস বাহিনী আছে তাদের সকলের বিচার আমি অবশ্যই চাই।



দেবাশীষ রায়
পিতা : ঈশ্বর কেশব চন্দ্র রায়
বয়স : ৩৫
ঠিকানা : পরমাওয়াখালী
ডাকঘর : মাগুরখালী,
থানা : ডুমুরিয়া।

এলাকার পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল। আমরা বাড়িতে টিকতে না পেরে চাপের মুখে মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন একসঙ্গে বাড়ি থেকে একটা দিন ধার্য করে বার হলাম। বহু লোক একসঙ্গে নৌকা ভাড়া করে চুকনগর আসি। এসে দেখি হাজার হাজার নৌকা। আমরা আসার এক দেড় ঘন্টা পর খান সেনারা ২-৩টি গাড়িতে করে আসে। খান সেনাদের দেখে লোকজন ভয় পেয়ে ছোটাছুটি আরম্ভ করে। ওরাও অস্ত্রপাতি দিয়ে লোকজনকে ভয়-ভীতি দেখাতে লাগলো। বাবাসহ আমরা ছিলাম নৌকার এক সাইডে। ওরা সবাইকে লাইন দিতে বললো। লাইন দেওয়ার একটু পরেই গুলি শুরু করলো। বহু লোকজন মারা পড়লো। আনুমানিক ১০-১১ হাজার লোককে হত্যা করেছিলো। আমার বড়ভাই, মেজ কাকা, সেজ কাকাকে লাইনে গুলি করে মারলো। আমার মারও বাম পাশে গুলি লাগে। বাবা আর সহ্য করতে না পেরে বললেন "তোরা যেটা ভালো বুঝিস সেটা কর। আমি আর বেঁচে থেকে কি করবো। আমার ভাই গেল, ছেলে গেল, স্ত্রীও যাবার পথে,"। আমরা খুব অনুরোধ করলাম, শুনলো না চলে গেলো। পরে বাবাকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করে।



পুষ্প রানী রায়
পিতা : কালিচরণ মণ্ডল
পেশা : গৃহপরিচারিকা
গ্রাম : কাতিনংলা
থানা : বটিয়াঘাটা।

বৈশাখ মাসের শুরুতেই চারদিক থেকে গোলাগুলির কথা শুনা যাচ্ছিলো। লোকজন বর্ডার ক্রস করে ভারতে পাড়ি জমানোর উদ্দেশ্যে চুকনগর বাজারে জড়ো হচ্ছে। আমরাও জ্যৈষ্ঠ মাসের কোনো একদিন তারিখটা আমার মনে নেই, বাড়ি থেকে রওয়ানা করে মাইলমারা বাজারে পৌঁছলাম। সেখানে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয়ায় সেদিনই নৌকা করে চুকনগর বাজারে পৌঁছি। সেদিন ছিল বৃহস্পতি অথবা শুক্রবার। রান্না চড়িয়েছি, এমনি সময় পনেরো/ষোল জন পাক

সেনা দু'টো গাড়িতে এখানে এলো। লোকজন ভয়ে ছুটোছুটি করে পাশের পুকুরে ঝাপিয়ে পড়লো। আমার কোলে ছিল ছোট ছেলেটি। বড় ছেলেটিকে নিয়ে তার বাবা পানিতে একবার ডুব দিচ্ছিলো, আর একবার ভেসে উঠছিলো, এমনি সময় পাক সেনারা তাকে গুলি করে। এ অবস্থায় বড় ছেলেটি হারিয়ে যায়। বাচ্চারা ভয়ে যাতে কাঁদতে না পারে সেজন্য মুখ চেপে লোকজন পানিতে ডুব দিচ্ছিলো। তিনটি পুকুর যথাক্রমে পাঁচ/ছয় কাঠা জায়গার মধ্যে, পুরো পানি রক্তে লাল হয়ে যায়।

সেদিন পাক সেনারা কিছুক্ষণ এলোপাথারি গুলি করে চলে যায়। আমরা তখন পুকুর থেকে লাশ উঠিয়ে নিচ্ছি, চতুর্দিক থেকে কান্নার আওয়াজ, আপনজনকে খুঁজছে। বড় ছেলেটিকে আমার ভাই খুঁজে পায়। তাকে সহ আমরা আরো অনেকে গঙ্গারামপুর চলে যাই। দেশ স্বাধীন হলে চলে আসি।

"আমাদের দেহের খোলে কতখানি ব্যথা যে, অতুল সমুদ্রে ভাইসা বেড়াচ্ছি বাচ্চা কয়ডা নিয়ে তা ভগবান জানে। এরজন্য যারা দায়ী এদের শাস্তি হবে নাতো কি? এদের অবশ্যই শাস্তি হউক।"



মুকুন্দ বিহারী রায়
পিতা : মৃত শিবপদ রায়
পেশা : গ্রাম ডাক্তার
গ্রাম : আলাদীপুর
ডাকঘর : মাগুরখালী
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে আমি ১৮/১৯ বছরের তরুণ। সবে মাত্র ক্লাস নাইনের পরীক্ষা দিয়েছি। তখন দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। তখন একদিন একদল সন্ত্রাসী, যাদেরকে অনেকে বিপ্লবী কমিউনিস্ট বলে জানতো, তারা আমাদের এলাকার খুব ধনী, জ্ঞানী ও মানি পরিবারের তিন ভাই পুলিন বাবু, দয়াল বাবু ও বিষ্ণু বাবুকে মেরে ফেলে। তখন এলাকার সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, ওনাদের যখন মেরে ফেলেছে তখন আমাদেরও মেরে ফেলবে। বাঁচতে হলে ভারতে চলে যেতে হবে।

আমরা তখন ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ৪ জ্যৈষ্ঠ বুধবার দিবাগত রাতে আমরা চুকনগরের উদ্দেশ্যে নৌকা করে যাত্রা করি এবং ৫ জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে চুকনগরে এই পুটিবাড়ি কলেজের সামনে এই বিলে এসে আমাদের নৌকা ভিড়ে। আমাদের মতো অসংখ্য পরিবার ছোট ছোট নৌকায় করে এই বিলে পৌঁছে। ফলে পুরো বিলটিই নৌকায় নৌকায় পূর্ণ হয়ে উঠে। এই অবস্থায় বাবা বলে "দেখো আমরাতো চুকনগরে আইসা গেছি। এখন আমাদের গাড়িযোগে চইলে যাইতে হবে। তোমরা কিছু কিছু বোঝা মাতায় নাও।" আমার মাথায় একটা বোঝা থাকলো। আমার

অন্যান্য ভাইদের প্রত্যেকের মাথায় ঐরকম বোঝা ছিল। আমরা যখন রাস্তার ওপর, তখন দক্ষিণ দিক থেকে দু'টো মিলিটারীর গাড়ি এসে কলেজের এই জায়গাটাতে এসে থামে। গাড়ি দুটো থেকে কিছু লোক নেমে যায়। ওখান থেকে একটি গাড়ি দক্ষিণের রাস্তা দিয়া মুচিপাড়ার দিকে যায়! আর একটা গাড়ি খুলনা রোডে যায়! এই দু'টো গাড়ি থেকে যারা নেমেছিলো তারা উড়ো ফায়ার করতে থাকে। উড়ো ফায়ার যখন করে তখন লোকজন হৈ-চৈ করে!

এই অবস্থায় আমার জেঠা মশাই যিনি গ্রাম্য ডাক্তার ছিলেন, তিনি বলেন "দেখ মিলিটারীরা আইসা গেছে, এখন যদি এদের সামনে লাইন দিয়া দাড়াইয়া, স্যালুট দেয়া হয়, তাহলে এরা গুলি করবে না।" আমার বাবাসহ গ্রামের লোকেরা জ্যাঠা মশাইয়ের কথা শুনলো। আবার কিছু লোক শোনল না। আমরা লাইন দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে মিলিটারীরা গুলি করতে শুরু করলো! আমার বাবা, জ্যাঠা মশাইসহ যারা লাইনে ছিল, তাদের ওপর মিলিটারীরা গুলি করে দিলো। গুলি খেয়ে সবাই পড়ে গেল কিন্তু সবাই মারা যায়নি, কিছু লোক বেঁচে ছিল। এর মধ্যে আমার ছোট কাকা বেঁচে ছিল। আমার এক ভাইও বাঁচা গেল। আমার বাবা, বাবার তিন ভাই ও আমার এক জ্যাঠাতো ভাই মারা যায়। আমার বড় জেঠিমার মাজায় গুলি লাগে। মেঝ জেঠিমার কপালে গুলি লাগে। এই অবস্থায় ওরা 'বাইছে বাইছে' পুরুষ মানুষগুলোকে গুলি করতে লাগলো। তখন আমরা জীবনের ভয়েতে নৌকার নিচে 'ডুবায়ে ঘোলা জলে ডুব মাইরে মাইরে থাকতে লাগলাম।' অনেকক্ষণ পর কিছু দূরে তাঁকায়ে দেখি একটা পাট বন। সেই পাট বনের ধারে একটা খাল আছে। খালের সাইডে দিয়ে কিছু ঝোঁপ-ঝাড় আছে, সেই ঝোঁপ-ঝাড়ে গিয়ে লুকায়ে থাকলাম। আনুমানিক বেলা দুইটা পর্যন্ত পানিতে ও কিছু সময় পাট ক্ষেতের পাশের ঝোঁপ-ঝাড়ে থাকার পর সেখানেও গুলি আসতে থাকলে ভয়েতে পাশের একটি বাড়ির পুকুরে পড়ি। আমি আমার মাথাটা জলের দিকে দিয়ে নাকটা কোন রকমে জলের ওপর রেখে বাঁইচা থাকি। আমার মা, ভাই, ঠাকুরমা কোথায় আমি তখনও বলতে পারি না। বিকেল ৪টা পর্যন্ত জলের ভিতর থাকি। খান সেনারা ঐ এলাকায় নেই নিশ্চিত হয়ে সন্ধ্যা বেলায় আমি পানি থেকে উঠি। উঠে দেখতে লাগলাম কে, কোথায় মরলো।

যেখানে আমার বাবা জেঠামশাইকে লাইন দিছিলো সেটা নিশানা করে আইসে খোঁজা শুরু করে দিই। যেয়ে দেখি আমার বাবা, জেঠামশাই এবং জেঠাত ভাই মারা গেছে! তখন কান্না-কাটি শুরু করি। মা, ভাই বা ঠাকুরমা কারোরে পাইনে। এ অবস্থায় গ্রামের লোকজন যেনারা ছিলেন তাদের সাথে সন্ধ্যায় বাড়ি দিকে রওয়ানা দেই। পথে আমার ছোট ভাইকে খুঁজে পাই। একদিন পর মা ও বোন দু'জনকে খুঁজে পাই।

পরের দিন মাকে খুঁজে পেয়ে আমরা যখন কান্নাকাটি শুরু করি তখন রাজাকাররা আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে আমাদের মারতে/ধরতে যায়। আমরা দু'ভাই চলে যাই দুই দিকে, আমাদের না পেয়ে অন্যদের সাথে ভারতে চলে যায়।

পরের দিন আমরা আবার বাড়িতে ফিরে আসি এবং বড় ভাই ও ঠাকুরমাকে

ফিরে পাই। আমাদের বাবার একটি দোনালা বন্দুক ছিল। এই বন্দুকটি নেয়ার জন্য রাতে রাজাকাররা আমাদের দু'ভাইকে বাধে, এবং মার্তি মার্তি জানতি চায় বন্দুক কোথায়? আমরা বলি জানিনে। 'যারা আমাদের মারিছিলো তাদের অনেকে বাঁইচা আছে, কিন্তু আমরা সেই কথা বলতে চাইনে বা বলিনে।' তবে একজনের নাম আমি জানি তিনি এই জায়গার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গোলাম হোসেন। গোলাম হোসেন বাঁইচা আছে কিনা এইডা আমি সঠিক জানিনে। তিনি খান সেনাদের একজন নিকটতম লোক ছিলেন। এই গোলাম হোসেনরাই খান সেনাদের ঐ সাতক্ষীরা লাইনে থেকে যোগাযোগ করে নিয়ে আছে। আমাদের অর্থ, সোনা-দানা যা আছে তা লুটতরাজ করে নেয়ার জন্য।



জয়ন্তি সরকার
স্বামী : ডাক্তার নকুল চন্দ্র সরকার
বয়স : ৫৫
গ্রাম : মাইলমারা বাজার।

১৯৭১ সালে আমরা বটিয়াঘাটা থাকতাম। চুকনগর গণহত্যার আগে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা আমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমরা ভারতে যাওয়ার জন্য চুকনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। দিনটি ছিল বুধবার। আমরা ডুমুরিয়া গিয়ে পৌঁছলাম। বৃহস্পতিবার সকালে নৌকা করে আমরা চুকনগর এলাম। চুকনগরের অবস্থা বটিয়াঘাটার অবস্থা থেকে ভালো ছিল। আমরা রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করছিলাম। সকাল ১০/১১টার দিকে মিলিটারীরা গুলি আরম্ভ করলো। ঐদিন কতলোক মারলো বলতে পারবো না। তবে মিলিটারীরা গুলি করে পাখির মত মানুষ মারলো। "চারিদিকে গুলির ফটফট শব্দ।" আমরা একসঙ্গে অনেক লোক ছিলাম, সবাই যার যার মত পালাতে থাকে। আমার সঙ্গে আমার বড় মেয়ে ছিল। তাদের মাজাইর বাড়ি 'লুটপাট' হওয়াতে তারা এখানে এসে থাকে। আমার স্বামী সকালে বেরিয়ে গেল। আমাদের বের হতে বারণ করলো। আমাদের বললো ভয় পাস না। "গুলি গোলা হবে।" আমাদের উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে বলে। সে আর ফিরলো না। গুলির শব্দে আমি পালাতে গিয়ে আহত একটা শিশুকে দেখতে পাই, তাকে বাঁচাতে পারলাম না। ঐখান থেকে আমার মেয়ে হারিয়ে গেল। "মেয়ে গিয়ে পড়লো একটা পুকুরে।" মিলিটারীরা প্রায় দুপুর পর্যন্ত গুলি করে। ঐদিন আমার স্বামী মারা যায়। আমার স্বামী মাইল মারা বাজারে ডাক্তারী করতো। বেলা অল্প একটু বাকী। লোকজন এসে বললো ডাক্তার নেই (মারা গেছে)। ঐ দিন আমার মেয়ের জামাইকেও মেরে ফেলে। মেয়ের জামাইর নাম নির্মল। বাড়ি ছিল গল্লামারী। এই খবর শুনে "সেইখানে যে কতদিন আমার কোন জ্ঞান ছিল না। মনে

হতো ছেলে মেয়ে লাগবে না। বাড়ি ঘর লাগবে না। নিজেকে উন্মাদ মনে হতো।"

আমরা চুকনগরে এসে স্নান করতে গিয়ে, খাওয়া দাওয়া করতে গিয়ে গুলি খেতে হলো। গুলি গোলা শেষ হওয়ার পর কাঁঠাল তলায় গিয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম। "খুঁজতি লাগলাম যে, মাইয়া মাজাই নেই ওর বাবা নাই। তখন ঐখানে মানে আর কোন হুঁশ থাকলো না।" আমার স্বামীর লাশও পাই নি।

এই হত্যাকান্ডের পর কেউই আমাদের সাহায্য করেনি। সে দিনের সে সব ঘটনা চোখের উপর ভাসছে। এই হত্যাকান্ড যারা ঘটিয়েছে আমি তাদের বিচার চাই। তাদের বিচারের জন্য প্রয়োজন হলে আমিও রক্ত দিব। এই এলাকার সব লোকজনও এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চায়।



মনিমোহন রায়
বয়স : ৭০
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : বটিয়াঘাটা
থানা : বটিয়াঘাটা।

বুধবার রাতে, ভোর হয়ে গেলে আমরা চুকনগর এসে পৌঁছালাম। ভারত যাব, তাই সবাই সমবেত হয়েছি। কেউ কেউ পাক-শাক করছি। এখানে-সেখানে বসে গল্প-গুজব করছি। হঠাৎ গুলি আরম্ভ হয়ে গেল। আমরা দেখলাম ২/৩ জন মিলিটারি ভ্যানে বসা, আর ৫/৬ জন পাকা রাস্তা দিয়ে বাজারে এসে গুলি করতে লাগলো। তখন কেউ কেউ আমাদের বললো তোমরা এখানে বসে আছে কেন? শুয়ে পড়ো একেকজন একেক রকম বলছে। কেউ কেউ দৌড়াদৌড়ি করছে। কেউ কেউ বেডিং নিয়ে বসে আছে। আমার প্রতিবেশী দুই ভাইকে বললাম আমার খোকা-খুকি ওরা সব ঘরে বসে আছে, আমি সেখানে যাব। তারা আমাকে যেতে নিষেধ করে বসে থাকতে বলে। এর মধ্যে গুলি আরম্ভ হতেই আমার ঐ দুই ভাইকে গুলি করলো। একজনের গুলি লাগতে লাফ দিয়ে পড়ে গেল। আর একজনকে গুলি করলে তার খুলি উল্টে পড়ে গেল। পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন ওদের গুলি করে এই ফাঁকে আমি দৌড়ে এসে বাজারে একটা ঘরের ভেতরে আমাদের গ্রামের সবার সঙ্গে থাকি। সেখানে আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে সবাই ছিল। সেখানে থাকা নিরাপদ না ভেবে সবাইকে নিয়ে একটা 'ফাঁকের' মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাতরিয়ে ওপার থেকে একটা নৌকা এনে ওদের পার করে দিলাম।

আমার সঙ্গে আরো যে লোকজন ছিল তাদের ৪/৫ জন করে মোট ৩/৪ বার 'খেপ' দিলাম। যে সময় আর্মি গুলি করতে করতে আমার নিকট আসলো তখন আরো কতজন লোক থেকে গেছে। আমি তাদের বললাম তোমরা নৌকায় করে আসো। আমি ঝাঁপ দিয়ে ওপারে একটা গাছের আবডালে দাঁড়িয়ে গুলি করা

দেখছিলাম। আমাদের পরিচিত একটা ছেলেকে গাছের খোপে একটা বিহারি মুসলমান এসে গুলি করে মারতে দেখলাম। ১২/১টার দিকে ওরা চলে গেল। তখন আমরা আমাদের লোকজন খোঁজ করতে লাগলাম, যেয়ে দেখি লাশ আর লাশ। আমার শ্বশুর জানালেন আমার মেজদা বেঁচে নেই। লাশের রক্তে মাটি লাল হয়ে গেছে। পুটিমারি বিলে খালি মাথা আর মাথা, ওখানে যারা পালিয়েছিলো তাদের গুলি করে মেরে ফেলেছে। রক্তে রক্তে জল সব লাল হয়ে আছে। আমার শালার ছেলে এবং গ্রামের কিছু লোক মারা গেল। তখন হিসাব করে দেখলাম যেটুকু দেখেছি তাতে দু-চার হাজারের বেশি হবে মানুষ মারা গেছে। সব এলাকা দেখিনি, শুধু নদীর আশ-পাশের জায়গা। ভারি করুণ সে সব দৃশ্য। কেউ কাঁদছে, কেউ একটু জল চাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে এলে আমরা একটা গ্রামে যেয়ে শুধু রাতটুকু থাকার ব্যবস্থা করি। পরের দিন সকালে সেখান থেকে ইন্ডিয়া চলে যাই।

আমরা কিছু করলাম না। নিরীহ মানুষ যারা জমিজমা, বাড়িঘর ফেলে চলে যাচ্ছে, পথে এভাবে অন্যায়ভাবে যারা মারলো তাদের বিচার হওয়া উচিত।



বলাই গোলদার
বয়স : ৬০
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : উত্তর বাঙ্গিমারি
ডাকঘর : জলসা
থানা : বটিয়াঘাটা।

হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে চুকনগর কলেজের ভেতর আমাদের একটি মেয়ে হয়। ওদের পরিষ্কার-টরিষ্কার করে যখন ভারত যাবার উদ্দেশ্যে বাসে উঠিয়ে দেই, তখন দক্ষিণ পাশ দিয়ে গুলি শুরু হয়। বাসওয়ালা ওদের নামিয়ে দিয়ে বাস নিয়ে চলে যায়। তখন একটা ছত্রভঙ্গ অবস্থা হলো। আমি কাউকে খুঁজে পেলাম না। মারাত্মক গুলি হওয়া দেখে আমি কাঁদতে লাগলাম। আমি গাঙ পার হয়ে গেলাম, আবার ফিরেও আসলাম। গুলি চললো প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত। সবাইকে খুঁজে ফিরছি, কাউকে পাই না। ঐ গ্রামের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর খালি জলে বুক ভাসছে। বউটারে পেলাম না। বড় মেয়েটাকে চুকনগরে যে কালিঘর সেখানে পাই। তার (স্ত্রীর) খোঁজ-টোঁজ না পেয়ে আশা ছেড়ে দিলাম। ছোট মেয়েটাকে একজন মুসলমান নিয়ে যেয়ে দশদিন লালন-পালন করে। তারা ওর স্বজাতি নাম রাখলো জুলেখা। আমি ওর নাম রেখেছিলাম জ্যোৎস্না। পরে তারা মঙ্গলকোটে ওর মার কাছে দিয়ে যায়। কালি মন্দিরে আমার মেয়েকে কোলে দিয়ে ওরা (স্ত্রী) দৌড় দিয়ে জলে পড়েছিলো। পরে ভাসতে ভাসতে ভাটায় গিয়ে বেঁচে গিয়েছিলো।

সেদিনের কথা কি বলবো স্যার। একজনের পেটের ভুড়ি আরেকজনের সাথে লেগে ছিল। ঘাড়ের এখানে গুলি লেগেছে সে সব কথা বলা যায় না। ওরা মেয়েদের মারেনি বাইচান্স ওদের গুলি লেগেছে। অনেক স্ত্রী যখন স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছে তখন স্ত্রীকে সরিয়ে ফেলে দিয়ে স্বামীকে ধরে মেরেছে। এখানে-সেখানে বহু লোক মেরেছে ২০ হাজারের উপর হবে। রামপাল, বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, বাগেরহাটসহ ঐদিকের সব লোকজন বেশি ছিল। ওরা (আর্মি) ৬/৭ জন লোক গাড়িতে করে সাতক্ষীরা দিয়ে এসে মারা শুরু করে। নদীর ওপাশ দিয়েও গুলি করতে করতে যায়। সেদিনের হত্যাকাণ্ডে শরণার্থীরাই বেশি মারা যায়। ওরা (আর্মি) চলে যাবার পর স্থানীয় কিছু লোক লুটপাট করেছিলো।



দলিল উদ্দিন সরদার
বয়স : ৫৫/৬৫
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

আমি সে সময় ('৭১) আটা, চাল ডুমুরিয়া থেকে খুলনা নিয়ে বিক্রি করতাম। এলাকার পরিস্থিতিটা 'খারাপ খারাপ' ছিল। মিলিটারির তাড়নায় হিন্দুরা সব ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছিলো। জ্যৈষ্ঠ মাসের ৫ তারিখ ২টি গাড়িতে করে ৮/১০ জন মিলিটারি বিলের ভিতর দিয়ে পুটিরপাড় দিয়ে গুলি করতে আরম্ভ করে। আমি কাজ ফেলে দিয়ে আমার মেয়েছেলে ও বৌকে নিয়ে নৌকার ভিতর যেয়ে বসলাম। বসার খানিকটা পরে দেখলাম যে ঐ হিন্দু বাড়ির দিকে একটা বাড়িতে আগুন জ্বলছে। আমরা তখন নৌকা থেকে নেমে দক্ষিণ পাশের এক বিলের 'খানা'র ভিতরে আমার এলাকার লোক সব ঐ জায়গায় যেয়ে 'পড়ে' থাকলাম। অনুমানে বেলা ১০টা-১১.৩০টা থেকে আরম্ভ করে বেলা ৩/৪টা পর্যন্ত একই খানার মধ্যে পড়ে থাকলাম। পড়ে থাকলেও গুলির 'দুমদুমা' চলছিলো। দুম উঠে যাচ্ছে, আগুন উঠে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা শ্বাস টানতে পারছে না। কাপড় মুড়ি দিচ্ছে, আর রোদও তো খুব। ছেলেমেয়ে রাখা যাচ্ছে না একটা হই-চই। এরই মধ্যে মুসলমানরা 'নারায়ে তাকবীর' বলছে আর হিন্দু পাড়ায় ঐ পাশে গুলি করছে। তারপরে বাবা, আর বলবো কি সে দুঃখের কথা। আমার ৩৬ হাজার টাকা দিয়ে কেনা নৌকাটা পুড়ে ছাই। আমার মা বললো—'বাবা তুমি তো আর এদেশে থাকতে পারবা না। তুমি তোমার শ্বশুর বাড়ি যাও।' তারপর মাইল দুয়েক দূরে বউ, বাচ্চাসহ সেখানে যেয়ে থাকলাম।

আমরা দুই ভাই মিলে ২০০ লাশ নদীতে ফেলি। ঐ মরা ফেলে আমি একটা

'বিরাট' ভয় পেলাম। না ফেলে উপায় ছিল না। আমার কালা জ্বর হলো। জ্বর আর সারে না। পরে খুব কষ্ট-সষ্ট করে ভালো হলাম। কলেজের পাশে যে ঝাউতলা সেখানে কিছু লাশ মাটিচাপা দিয়েছে শুনেছি। "আমার প্রশ্ন একটাই 'বিচারটা হলো না কেন? তুমি রাজাকার হয়ে সব খেয়ে ফেল্লা। আমি এ কষ্ট করলাম। আমি আজ পর্যন্ত গরিব, তুমি বড়লোক। এই বিচারটা আজ পর্যন্ত কোন সরকারই করতে জানলো না।"



তুলাবতী বৈরাগী
পিতা : রুক্মীনি বৈরাগী
বয়স : ৫৫
পেশা : গৃহপরিচারিকা
গ্রাম : আউশখালি
ডাকঘর : কাঞ্চননগর
থানা : বটিয়াঘাটা।

'৭১-এ আমি একজন গৃহবধূ। স্বামী-সন্তান নিয়ে ভালই ছিলাম। কিন্তু যুদ্ধের দু-এক মাস পর থেকেই আমাদের এদিকে গোলাগুলি, লুটতরাজ হচ্ছিলো। তাই আমরাও অন্যদের মত ভারতে চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওয়ানা করি এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের ৫ তারিখে চুকনগর পৌছি।

দুপুরে খাওয়ার জন্য রান্না করছিলাম। এরই মধ্যে হঠাৎ গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। আমার স্বামী, বাবা, কাকা এঁরা ইতোমধ্যেই বিছানা গুটিয়ে ফেলেছে। আমার কোলে ছিল সাত মাসের মেয়েটি। ছোট ভাইটি আমার পাশেই আধশোয়া অবস্থায়। "ওরা আমাদের দিকে আসতেছে। বুঝছি ইস এইবার আমারে গুলি করতেছে। তহন ফটাস কইরা আমার ভাইরে গুলি করলো। তার কান দিয়ে গুলি ঢুকে গেল। ভাই মা বইলা চিৎকার করে। তহন চেয়ে দেখি ভাই ছটফট করতেছে। বলছে মা জল।" মা জল আনতে চলে গেলে আমি এসে দেখি গুলিতে আমার স্বামী ও বাবার মাথার খুলি উড়ে গেছে। "তাদের চোখ দুইহান এইরম ভাইসা পড়ি আছে।" মেজ মেয়ের হাতে গুলি লাগে।

সেদিন সেখানে আমার পরিবারের ভাই, বাবা ও স্বামী ছাড়াও মামাতো ভাই, জ্যাঠাতো কাকা মারা যায়।

পরবর্তীতে পাকসেনারা চলে যাওয়ার পর আমি সেখানেই বসে থাকলাম। "বাচ্চা-কাচ্চা কোল থেকে নামায় দিলাম। বললাম আমি দেশে যাব না, আমার বেডিং খুইলে দাও। আমি এই জীবন রাখব না।" মাসীমা, আমার ছেলে বুঝিয়ে আমাকে নৌকায় উঠালো। "দেখলাম নৌকা যেখান দিয়ে যায়, সেখানেই লাশ।" বহু কষ্টে আমরা সেদিন এ জায়গা থেকে চলে যেতে পারি। সুতরাং এ হত্যাকাণ্ডের জন্য যারা দায়ী আমি তাদের ফাঁসি চাই।



আলি বাদশা
পিতা : মৃত সবেদ আলী সরদার
বয়স : ৫৫
পেশা : ব্যবসা
গ্রাম : ৫ নম্বর আটলিয়া, চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

১৯৭১ সালে আমি ২০/২১ বছরের যুবক, তখন এখনকার মতোই আমি ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলাম। ১৯৭১ সালের ২০ মে, ৫ জ্যৈষ্ঠ যেদিন চুকনগর গণহত্যা সংঘটিত হয়। এর কয়েক দিন আগে থেকেই চুকনগর এলাকায় বিভিন্ন এলাকার শরণার্থীদের আগমন বাড়তে থাকে। কিন্তু এর পূর্বে পাকবাহিনী কখনও এলাকায় আসেনি। ২০ মে সকাল বেলার কথা, বাজারে প্রচুর লোক সমাগম দেখে আমি নদীর ঘাটে গেলাম। আমি যখন নদীর ঘাট থেকে ফিরে আসছি। তখন একটা লোক আমাকে ডেকে বললো "বাবা তুমি তো খালি হাতে যাচ্ছ। আমার বোচকাডা নিয়ে যাও।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বোচকার ভিতরে কি আছে?" সে জানালো এর মধ্যে আছে একটা মশারি, এক কেজি চিড়ে আর আধ কেজি চিনি। আমি বাড়ি এসে বোচকা খুলে দেখলাম লোকটির কথামতো জিনিসই রয়েছে। এরপর আমি বাজারে চলে এলাম। দোকান খোলার সাথে সব বিক্রি হয়ে গেল। আমি বাড়িতে খবর পাঠালাম। আমাদের কলই যদি বেশি থাকে, তবে তা যেন বিক্রির জন্য পাঠিয়ে দেয়। আমি যখন দোকানে বিক্রি করছি তখন এই কলেজের পাশ থেকে গুলি শুরু হলো। পট পট শব্দ করে গুলি করে ওরা এগিয়ে আসছিলো। আমি তখন বাড়ির দিকে পালালাম। সকাল থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে বেলা তিনটা-চারটা পর্যন্ত চললো। পরদিন সকাল বেলা ওহাব মেম্বার বললো "লাশ যদি না ফেলাস তবে তোমরাই গন্ধে মরবা।" সে আরও বললো "দ্যাখ যদি তোদের কিছু পাসতো পাইলি, আমরা কিছু বাড়তি দিয়ে দিবানে।" এই শ্যাযে ফেলায়ে ঠেলায়ে পরে দেখা গেল ২৫টি করে টাকা পেলাম ভাগে। আমরা ২৫টি করে লাশ ফেললাম। সব গাঙে ফেললাম। আমরা প্রায় চার হাজার থেকে বিয়াল্লিশশোর মত লাশ ফেললাম।



অরবিন্দ দাস
পিতা : শ্রী পাগল চন্দ্র দাস
বয়স : ৪৬
পেশা : কাঁকড়ার ব্যবসা
গ্রাম : পুটিমারি
থানা : চুকনগর।

চুকনগর গণহত্যার তারিখটা মনে নেই। তবে যতদূর মনে পড়ে বৃহস্পতি বা শুক্রবারের ঘটনা। চুকনগর বাজার এবং এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামে অগণিত মানুষ সেদিন জড় হয়েছিল। সবার উদ্দেশ্য ভারত যাওয়া। কেন এই অসহায়, নিরপরাধ মানুষগুলো নিজের বাস্তুভিটা ছেড়ে দেশান্তরি হবার সিদ্ধান্ত নিল? এর পটভূমি তৈরি করেছে রাজাকাররা। দিনের পর দিন রাজাকারদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে। বাধ্য হয়ে জীবন-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অগত্যা ভারত যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো এই মানুষগুলো।

কিন্তু অধিকাংশের আর ভারতে যাওয়া হলো না। এই এলাকার রাজাকাররা পাকবাহিনীকে খবর দিয়ে নিয়ে আসে। রাজাকারদের মধ্যে আবুল কাশেম আর শাজাহাদের নাম মনে পড়ছে। তবে চুকনগরে এক পাকিস্তানি ছিল, তাকে আমরা খান সাহেব বলে ডাকতাম। চুকনগর গণহত্যার জন্য সেও দায়ী ছিল।

গণহত্যার দিন আমি চুকনগর কলেজের ('৭১ সালে চুকনগর কলেজ ছিল না) পেছনের বিলে কাজ করছিলাম। বেলা ১০/১১টার দিকে পাকসেনারা গাড়ি থেকে নেমে মানুষজনকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারছে। এই অবস্থা দেখে আমি বিল থেকে উঠে বাড়ি গিয়ে পরিবারের লোকজনসহ সবাইকে নিরাপদ আশ্রয় নেবার জন্য বললাম। আমরা একটা মাটির গর্তে লুকালাম। কিন্তু পাকবাহিনীর চোখে পড়ে গেলাম। আমাদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি হামলা করে। "আমাদের সামনে বিশ-চল্লিশজনকে গুলি করলো। তখন আমরা মনে করলাম এ তো আমাদেরও বাঁচায়ে রাখবে না। এনারা যে কায়দায় গুলি করতেছে। আমাদের সঙ্গে নিয়ে আমার দাদা, ঠাকুরদাকে গুলি করলো। আমার পড়শী আর এক দাদা হয় তাকে গুলি করলো আমাদের সামনে। আমার আরেক ভাই সম্পর্কে হয় কালাচাদ তাকে গুলি করলো। এমনকি বেয়নেট দিয়ে ওগো মারলো এখানে। প্রত্যেক বাড়িতে দুজন, চারজন, পাঁচজন করে মারিছে।" অগণিত মানুষ পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে অনেক নারী, শিশু-বৃদ্ধ আহত হয়ে বাঁচাও, বাঁচাও বলে সাহায্য প্রার্থনা করছিলো।

মাঠের মধ্যে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেও পাকবাহিনীর আশা মেটেনি। তারা রায়পাড়া বাজারের কালিমন্দিরের কাছে বটগাছের শেকড়ের গর্তে কিছু লোক লুকিয়েছিলো—তাঁদের সেখান থেকে বের করে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া গ্রামে বহু বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমাদের গ্রমের আশেপাশে রাস্তায় পাকবাহিনী মাটি খুঁড়ে কামান বসায়।



এ. বি. এম. শফিকুল ইসলাম
পিতা : মরহুম ইউসুফ আলাউদ্দীন
বয়স : ৪৪
পেশা : শিক্ষকতা
গ্রাম : চুকনগর
ডাকঘর : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

চুকনগর গণহত্যার আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। মুক্তিযুদ্ধের সময় চুকনগর স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। মে মাসের দিকে সারা দেশেই পাকবাহিনী এবং রাজাকারদের অত্যাচারের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। যে কারণে খুলনা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন যোগাযোগ সুবিধার বিবেচনায় চুকনগরের পথটি ব্যবহার করতেন। মে মাসের উনিশ তারিখে আশপাশের বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার লোক চুকনগরে সমবেত হচ্ছে। পরে জেনেছিলাম বাগেরহাট, বরিশাল, ঝালকাঠি, ফকিরহাট, মোল্লারহাট, চিলতিমারি বিভিন্ন এলাকার লোক জড়ো হয়। পরের দিন "সকালে দেখি যে সারা চুকনগর বাজার, চুকনগরের পাড়া মহল্লা বা চুকনগরের পাশে একেবারে বাজারের পাশে মালতিয়া বা মুরমিয়া এই সকল গ্রামে অসংখ্য মানুষ সব জায়গার মানুষ আর মানুষ তো এত মানুষ যে আমার ধারণা দুই/তিন লাখের কম হবে না।" ভারত সীমান্ত চুকনগর থেকে মাত্র ৩০/৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে ছিল বলেই হয়তো, বিশ্রাম এবং একত্রিত হবার জন্য চুকনগরকে বেছে নেয়া হতো।

মে মাসের বিশ তারিখ, সম্ভবত বেলা সাড়ে দশটা থেকে এগারটা হতে পারে। সাতক্ষীরা থেকে পাকবাহিনীর গাড়ি চুকনগরে আসে। চুকনগর পৌঁছানোর কয়েক কিলোমিটার দূরে সাতক্ষীরা রোডে পাকবাহিনী প্রথম গুলি করে। সকাল থেকেই চুকনগরে একটা চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছিলো। গুলির শব্দে নিরীহ মানুষগুলো প্রাণভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। পাকবাহিনীর একদল কাঁচা রাস্তা দিয়ে গ্রামের ভেতরে চলে আসে। আরেক দল পাকা রাস্তা দিয়ে চুকনগর বাজার আসে। অর্থাৎ বাজারটাকে হানাদাররা দু'পাশ দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। এলোপাথাড়ি গুলিতে "আমার ধারণা মতে মৃতের সংখ্যা দশ হাজারের বেশি ছাড়া কম হবে না।"

চুকনগর বাজারের পাশেই ছিল ভদ্রা নদী। তখন এই নদী ভীষণ খরস্রোতা ছিল। "তখন আমি দেখি যে অনেক মহিলা তারা জীবন বাঁচানোর জন্য নৌকায় উঠতে গেছে, হয়তো পা পিছলে পড়ে গেছে। স্রোতে ভেসে চলে গেছে। নিঃসন্দেহে সে মহিলার বাঁচবার আর কোন সুযোগ নেই, বা তাকে বাঁচানোর মতো কেউ ছিল না।"

নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষ যখন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াচ্ছে তখন অনেকের পায়ের নিচে শিশু বা বৃদ্ধের জীবন গেছে। পাকবাহিনী চলে গেলে দেখলাম কেবল লাশ আর লাশ। মৃতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। তবে যাঁরা

লাশ অপসারণ করেছিলেন তাঁরা ৪২'শ থেকে ৪৪'শ পর্যন্ত গুনেছিলো।

ভদ্রা নদীর পাড়ে একটি বিশাল বটগাছ ছিল। গুলিগোলা যখন চলছে তখন কেউ কেউ বটগাছের শিকড়ের ফাঁকে লুকিয়ে ছিল। ভেবেছিলেন পাকবাহিনীর চোখ এড়াতে পারবে। কিন্তু হত্যাকারীরা সেখানেও উপস্থিত হয়। প্রায় ৩০/৪০ জন মানুষকে সেখানে হত্যা করে। এর মধ্যে বাবুরাম বিশ্বাস নামে আমাদের এলাকার একজনও মারা যান। এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর পাকবাহিনীর সদস্যরা হাসাহাসি আর উল্লাস করতে করতে চলে যায়।

এই গণহত্যায় যাঁরা আহত হয়েছিলেন তাদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়েছে। আমার মনে আছে এক মহিলার কথা, যাঁর গলায় গুলি লেগেছিলো, ফলে মুখ দিয়ে খাবার খেলে গলা দিয়ে খাবার বেরিয়ে আসতো।

দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্রের ১৫ খণ্ডের কোথাও চুকনগরের কোন কথা নেই।

চুকনগরে যে হাজার হাজার নিরীহ, অসহায় মানুষদের হত্যা করা হয়েছে তার অবশ্যই আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে বিচার হওয়া উচিত।

এ্যাডভোকেট সুভাষচন্দ্র তরফদার
বয়স : ৩৮ (অনুমান)
পেশা : আইনজীবি
গ্রাম : মাইটভাঙ্গা
ডাকঘর : বটিয়াঘাটা
থানা : ডুমুরিয়া।

চুকনগরে গণহত্যা হয়েছিল ২০ মে ১৯৭১। আমরা বাড়ি থেকে বের হই আগের দিন অর্থাৎ ১৯ মে। সে সময় আমি প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করি। চুকনগর থেকে আড়াই মাইল দুরে বাটিয়াঘাটা থানার দক্ষিণ-পশ্চিমে ২নং ইউনিয়নের একদম মধ্যবর্তী গ্রামটি আমাদের। আমাদের ইউনিয়নটি নদী বেষ্টিত। নিরাপদ স্থান মনে করে খুলনা শহর আশে-পাশের গ্রামগুলো থেকে বহু লোক একানে আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯ তারিখ বুধবার সকাল ৭/৮ টার দিকে আমাদের বাড়ির পূর্ব দিকে কুলতলা গ্রাম। নদীর পাশে খান সেনারা গুলি শুরু করলে অসহায় মানুষজন বাড়িঘর ছেড়ে পশ্চিম দিকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা করে কুলতলার কিছু লোক যখন বাড়িঘর ছেড়ে আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে যায় তখন আমরা তা দেখতে থাকি। এবং আমাদের কিছু হিতাকাঙ্খী লোক যেমন—হরেন ঠাকুর, পুরোহিত আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে যাবার সময় আমার বাবাকে ডেকে বললেন—মনি, বাচ্চা, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে তো থাকতে পারবে না, চলো আমাদের সাথে। সে সময় হঠাৎ করে গুলোর শব্দও শোনা

যায় এবং আমাদের বাড়ি থেকে আধামাইল দূরে আগুন ধরিয়ে দেয়। সবাই বলছিল খান সেনারা আসছে এবং সাথে আরো কিছু লোকজনও আছে। আমরা তখন তড়িঘড়ি করে কিছু মালপত্র নিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা করলাম আমাদের বাড়ি থেকে দুই-আড়াই মাইল পশ্চিমে বাটিয়াঘাটা নামে একটা জায়গার নদীর পাড়ে বহু, অসংখ্য লোক জমায়েত হলাম। সেখান থেকে বহু কষ্ট করে নদী পার হয়ে হেঁটে হেঁটে ডুমুরিয়া থানার তেলিখালি জায়গায় উঠে সেখান থেকে ডুমুরিয়া বাজারে চলে গেলাম। রামপাল, মংলা বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে, নৌকাযোগে এসে আমরা অসংখ্য সব লোক ঐ বাজারে অবস্থান করলাম। তারপর দিন ঐখানে সকালবেলা খাওয়া-দাওয়া করে একযোগে সব পায়ে হেঁটে পশ্চিম দিকে রওনা হলাম।

আমরা যখন চুকনগর পৌঁছাই তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। আমার যতদূর মনে পড়ে যেয়ে দেখি কিছু লোক রান্না-বান্না করছে, কিছু লোক বিশ্রাম করছে, কেউ রান্না করবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে এরকম একটা পরিস্থিতি। আমাদের ফ্যামিলির সবাই চুকনগর বাজারের ইউনিয়ন পরিষদের সামনে কিছু আম গাছের নিচে মাল-পত্র রেখে বিশ্রাম করছি। বাবা ওখানে একটা টিউবওয়েল থেকে জল আনতে এবং বড় ভাইটা বাদাম কিনতে গেছে। আমি, আমার মা, আমার মাসি যিনি আমাদের সাথে থাকতেন তিনি ও তার ছেলে, আমার একজন বড় মা, আমার মা'র নানী এবং আমার মা'র মা'ও আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা এতগুলো লোক বসে আছি, তখন কয়টা বাজে দুপুরের পর হবে লোকজন সব দৌঁড়াচ্ছে আর বলছে যেভাবে পারো সরে যাও। খান সেনারা আসছে, গুলি করছে এবং সাথে সাথে শব্দও হচ্ছে, খুব শব্দ। লোকজন সব যে যেভাবে পারছে ছোটাছুটি করছে। দক্ষিণ দিকে গুলি হচ্ছে, উত্তর দিকে একটা নদী আছে। এই নদী কেউ নৌকাযোগে পার হচ্ছে, কেউ সাঁতরিয়ে পার হচ্ছে। আমাদের কিছু পরিচিত লোক যখন আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন আমি, আমার মা ও ছোট বোন সাথে সাথে দৌঁড়াতে লাগলাম। বাবা আর ভাই এসে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন আমি, আমার মা ও ছোট বোন সাথে সাথে দৌঁড়াতে লাগলাম। বাবা আর ভাই এসে আমাদের খুঁজে পেল না। আমরা পূর্ব দিকে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে এক বাড়িতে যেয়ে ঢুকলাম। চারিপাশে গুলি শুরু হয়ে গেছে। চোখের সামনে দেখলাম পুরুষ ছেলে ১৭/১৮ থেকে শুরু করে ৫০/৬০ বছরর পর্যন্ত লোক ধরে বেছে বেছে একসাথে বহু গুলি বার হয় সেই অস্ত্র দিয়ে গুলি করে মারছে। লোকজন দিকবিদ্বিগ ছোটাছুটি করছে। দেখা যাচ্ছে বহু লোক সাঁতরিয়ে পার হচ্ছে, তখনও গুলি করে মেরে ফেলছে। কেউ হয়তো সাঁতরিয়ে উঠে যাচ্ছে। কেউ পানির নিচে পড়ে যাচ্ছে আর উঠছে না। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেও এক পুকুর ছিল। সে পুকুরেও বহু লোক ছিল। তখন দেখলাম কেউ কেউ ডুব মারছে বা কাউকে গুলি করে মেরে ফেলছে। আমার বাড়ির পাশের কিছু লোক যাদের আমি চিনি যেমন বয়স্ক লোকদেরও তারা দেখে দেখে মারছে। গুলি খেয়ে লোকজন পাখির মত ছটফট করে মারা গেছে। এগুলো আমি এখনও স্মরণ করতে পারি। এসবই নিজের চোখে দেখা। প্রথম দিকে কান্নাকাটি করেছি।

চারিদিকে শুধু লাশ। নদীতে, পুকুরে শুধু লাশ আর লাশ, অসংখ্য লাশ মরে পড়ে আছে। পুকুরের জল একেবারে লাল হয়ে গেছে। আর আশেপাশে কত হাজার লাশ হবে তা অনুমান করে বলাও মুস্কিল। যারা স্থানীয় লোক তারা বলেছে কমসে কম দশ-বারো হাজার হবে। স্থানীয় লোক মনে হয় মারা যায়নি। তারা আগে থেকে পরিস্থিতি বুঝে মোকাবেলা করেছে। বাইরের লোক যারা অপ্রস্তুত ছিল তারাই মারা গেছে। পাকসেনাদের সাথে স্থানীয় কিছু লোক রাজাকার, আলবদর হবে সাদা পোষাকে ছিল এবং বাংলায় কথা বলছিল।

মা কাপড় মুড়ি দিয়ে বসেছিলো, আর আমার আড়াই বছরের ছোট বোনটি মার কোলে ছিল। যখন ঐ মারামারি, গোলাগুলি হয় তখন ও বাচ্চা মানুষ তাকিয়ে দেখছিলো যে কি হচ্ছে। সে সময় ওর দুই পায়েই ৩টা-৩টা করে ছয়টা গুলি লাগে এবং ডান পায়ে হাঁটুর নিচে একেবারে ছিড়ে যায়। সমস্ত শরীরের রক্ত বের হয়ে সে একদম আধমরা হয়ে পড়ে। মা ঐ নিয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে এবং তারপরে আমাদের পাড়ার কিছু লোকজন পেয়ে তাদের সাথে চুকনগর বাজারে এসে বসে থাকে। সন্ধ্যার কিছু আগে আমি, আমার মা, ছোটবোন এবং বাবা সবাই মিলিত হই। আমার মাসী, মাসতুতো ভাই, নানী এবং আমার বড় ভাই তারা কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে তাদের খুঁজে পাই নাই। তারপর আমরা পাশের একটা গ্রামে এক মুসলমানের কাছে আশ্রয় পাই। সেখানে রাতের থাকা-খাওয়া ও বোনের চিকিৎসা হয়। সকালবেলা আমরা পূর্ব দিকে কাঁঠালতলা বাজারে চলে আসি। সেখানে এক হিন্দু ভদ্রলোকের কাছে আশ্রয় পাই এবং সেখানে প্রায় দেড় মাস থাকার পর আমরা ইন্ডিয়া যাই। ঐখানে থাকা অবস্থায় ১৫/২০ দিন পর আমার বড় ভাই ও অন্যান্যদের খুঁজে পাই। আমরা যেহেতু সবার শেষে ভারত গিয়েছি সেহেতু আমরা বিহার প্রদেশে গয়া ক্যাম্পে ছিলাম। সেখানে আমার বোনের চিকিৎসা হয়। একবার আমাদের ক্যাম্পে ইন্দিরা গান্ধী এসেচিলেন এবং আমার বোনের পায়ে হাত দিয়ে বলেছিলেন সেরে যাবে। কিন্তু আমার বোন-বিকলাঙ্গ অবস্থায় এখনও বেঁচে আছে এবং আমাদের বাড়িতেই থাকে। তাকে এখনও বিয়ে-থা দিতে পারি নাই। সে ম্যাট্রিক পাশ করে বসে আছে। যুদ্ধে চুকনগরে যে হত্যাযজ্ঞ এখানকার একটা বড় প্রমাণ আমার বোনটা। যে একটা জীবন্ত ইতিহাস হয়ে আছে। আমার মনে হয় আমার বোনের মত যারা বিকলাঙ্গ হয়ে বা এই ধরনের অবস্থায় আছে তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। চুকনগরের এই ঘটনা আমার জীবনের একটা মর্মান্তিক ঘটনা। আমি মনে করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার যদি একুশ বছর পর হয়, তাহলে এই যে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এরও একটা সুষ্ঠ তদন্ত সাপেক্ষে বিচার হওয়া উচিত।



সরলা মণ্ডল
পিতা : রাজ কেষ্ট মণ্ডল
বয়স : ৩৫
পেশা : কৃষিকাজ (মজুর)
গ্রাম : শিবনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

মানুষের মুখে শুনছিলাম যে গণ্ডগোল লাগবে। আর গণ্ডগোল লাগলে প্রচুর লোক মারা পড়বে। বাবা একদিন হঠাৎ বললেন যে ইন্ডিয়ায় চলে যেতে হবে। সেই মতো একদিন ভোররাতের দিকে চিড়া, রুটি এবং কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে চুকনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। দিন, তারিখ মনে নেই। প্রায় চুকনগরের কাছাকাছি আসার পর বাবা নৌকা থামাতে বললেন। আমরা সবাই খেয়ে নিলাম। খাওয়া শেষ করে নৌকা আবার রওনা শুরু করলো। চুকনগর এসে পৌঁছলাম।

চুকনগরে পা দিয়েই দেখি মুসলমানেরা এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। "তারপরে দেখি যে চাইরখানা ট্রাক চইলে আসলো। চইলে আইসে তখন আমি মনে করতিছি কিরে কি ব্যাপার? চারখানা ট্রাক আসরে মানেটা কি? তারপরে দেখি যে ট্রাক আসার সঙ্গে একটু পরে চারদিকে গুলি মানে একেবারে যে রকম বটা পড়ে আর ঠিক ঐ রকম কায়দায় বটার মতো পড়তি লাগলো। আমি দেখে সময় সময় মানে অজ্ঞান হয়ে যাইতি লাগলাম। কি দিয়ে কি হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। এতো পরিমাণে গুলি পড়তেছে। আর আমি বসে রয়েছি মনে হচ্ছে যেন আমি রক্তের উপরে বসে রয়েছি।" এমন সময় দুটো ছেলে এসে বললো বোন আমাদের বাঁচাও। কারণ যুবকদেরকেই হত্যা করছিলো। আমি আর কি করি ছেলে দুটোকে আমার পেটের তলে রেখে, কাছেই দুটো নৌকা টেনে রেখে বসে আছি। হঠাৎ নৌকা ছিদ্র করে গুলি আমার মুখে এসে লাগলো। এরপর লাগলো পিঠে। এখনও বড় দাগ আছে। যা হোক আমি ছেলে দুটোকে বললাম তোমরা যে দিকে পার পালাও। তখনও আমি মা-বাবা-ভাইবোনের কোন খবর জানি না। নৌকা থেকে নামার পর গুলির শব্দ শুনেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। তারপর কাকীমার কাছে জানলাম গোলাগুলিতে আমার বাবা-দাদা দুজনেই মারা গেছেন। বাবার চোখের ভেতর দিয়ে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। আর আমার ভাইকে গুলি করার পরও আবার বেয়নেট দিয়ে কুপিয়েছে। আমি গিয়ে বাবাকে মৃত দেখেছি। কিন্তু ভাইয়ের তখনও প্রাণ ছিল। জল জল করে কাতরাচ্ছিলো। মা গিয়ে "রক্তের জল" (রক্তে নদীর পানি লাল হয়ে যায়) ভাইয়ের মুখে দিলো। একটু পরেই সে মারা যায়।

এরই মধ্যে পাকবাহিনী কয়েকজন নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। চুকনগর গণহত্যার হিসাব দেয়া সম্ভব নয়। সেদিন যতদূর দৃষ্টি যায় লাশ ছাড়া কিছু দেখিনি।

সমীর বিশ্বাস

বয়স : ৩৩
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : কাটিয়ানাংলা
ডাকঘর : কাটিয়ানাংলা
থানা : বটিয়াঘাটা।

চুকনগর গণহত্যার দিন মা, নানী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে আমরা ভয়ে একটি পুকুরের ভেতর ছিলাম। সব ঘটনাই মার কাছে শোনা। কারণ সে সময় আমি খুব ছোট, তিন বছরের। সেদিন ছিল ১৯৭১ এর ২০ মার্চ। সে সময় পাকিস্তানীরা চারিদিকে গুলি করে মানুষ মেরে ফেলছিলো। এরকম একটা পরিস্থিতিতে প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমরা সুদূর ভারতে যাচ্ছিলাম যাবার পথে চুকনগরে এই ঘটনা ঘটে। সেদিন চুকনগর যেয়ে একটা উঁচু জায়গার তাল গাছের নিচে রান্না-বান্না খাওয়া চলছিলো তখন ১০টার সময় পশ্চিমে বাজারের দিকে রাইফেলের ফায়ার হয়। আমার বাবা, মা, মামা ও অন্যান্য আত্মীয়রা বললো যে শত্রুরা ফায়ার করছে। কিন্তু বড় বড় শব্দ শুনে তারা মনে করলো যে হয়তো বাঁশের সাথে বাঁশ গাছ লেগে এরকম বড় বড় শব্দ হচ্ছে। ২০-২৫ মিনিট পর একটা লোক সাদা পায়জামা, মাথায় টুপি পরা বললো—'ভয় নেই, ভয় নেই তোমরা যেও না এখানে থাকে।' আমরা আধা বুক পানির একটা পুকুরে নেমে থাকলাম। ১০-১৫ মিনিট পর পাক আর্মি রাইফেল আর্মস ঘাড়ে নিয়ে পুকুরের চারিধারে ঘিরে গুলি করতে শুরু করে। পুরুষ লোকদের গুলি করলো। মেয়েরা বললো আমাদের গুলি করো। বলে তোমাদের জন্য গুলি নেই। আমার এক বুড়ো অশিক্ষিত নানী জোড় হাত করে বলে যাতে আর না মারে। কে কার কথা শোনে গুলিরই শব্দ শুধু। আমার নানী আমাকে এবং আমার মামাকে ছাতার বাট ধরে আড়াল করে রাখে, জলের কিছু উপরে ঘাটের ধারে। মামা নাকটা জলের থেকে দুই-তিন আঙ্গুল উঁচু করে রাখে। পাকিস্তানী সৈন্যরা তার চুল দেখে গুলি করে মারে। মাথার অর্ধেক ভাগ হয়ে গেল। ফোঁড়া হলে টিপলে যে পুঁজ আর রক্ত আসে সাদা সাদা সে রকম দেখালো। মাথার ঘিলু বার হলো সে কি করুন দৃশ্য! আমার বাবা আমার দাদাকে (ভাই) হাত ধরে পুকুর পার হয়ে চলে যাবে এই রকম চিন্তা-ভাবনার সময় গুলি করে মেরে ফেলে। দাদা হয়তো সাঁতার জানতো সে সাঁতরায়ে আমাদের কাছে চলে আসে। আমার ধর্ম মামা মানে আমার নানীর পালিত পুত্র সেও ঐ ডাঙ্গায় ধরে নদীর ধারে পালিয়ে যাওয়ার সময়কালে পায়ে গুলি লেগে পড়ে যায়। সে সময় আবার গুলি করে দেয়। সে সেখানেই মারা যায়। আমাদের যা কিছু ছিল টাকা-পয়সা জিনিষপাতি সব ফেলে দিয়ে ঐ ভিক্ষে করতে করতে কষ্ট করে সবাই আমরা আবার দেশের বাড়িতেই ফিরে আসলাম।

জিতেন্দ্র মিস্ত্রী

পিতা : হরিপদ মিস্ত্রী
বয়স : ৭০
পেশা : চাষাবাদ
গ্রাম : হোদল বুনিয়া
থানা : বটিয়াঘাটা।

চুকনগর হত্যাকাণ্ডের ঠিক আগের দিন পাক মিলিটারী আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে। ফলে আমরা ঐ দিন সন্ধ্যায় আমাদের গ্রাম থেকে শেয়ারের নৌকায় চুকনগর এর পথে যাত্রা করি। রাত বারোটার সময় শেয়ারের নৌকায় উঠলে তারপরে সারারাত চালিয়ে সকাল বেলায় চুকনগর পৌঁছি। এগারটার সময় আমরা নৌকা থেকে নামতে না নামতেই গুলি শুরু হলো। বাজারের দিক থেকে গুলি শুরু হলো। আমরা যখন দৌড় দিব, তখন দেখি "ছয়-সাত জন ওখানি গাড়িতে খাড়া। ওরা পাকা রাস্তা দিয়ে হাঁটি আসলো। গুলি করতি করতি ওরা আসতেছিলো। আমরা আর সরতি পারলামনা। সরতি না পারলি ওমনি কি করি। ঐ একটা উঁচা মতন জায়গা তারির নিচে জলের মতন আছে। তারপরে কি করি সাত-সতেরো না করে কলাম কি সবাই মিলে জলের ভিতর ঢুকে গেলাম। একটু গর্ত মতন জায়গা। সেখানে সবাই মিলে আশ্রয় নিলাম। একটু খানি জলের মধ্যে নাক ডুবিয়ে থাকলে দম বন্ধ হয়ে যায়। তাই ঐ জলের মধ্যে কাত হয়ে থাকলাম। কাত হয়ে থাকলি তারপরে এই রকম এইভাবে কাত হয়ে থাকলাম। তারপরও আমাদের সবার শরীরে গুলি লাগে। এই গুলির দাগ এখনও আছে। আমার তিনটে ভাই তারপরে বাবা, কাকা তারপরে দুইজন ভগ্নিপতি মানে সবার মাথায় গুলি লাগছিলো। আমার পরিবারের সাতজন মারা গেল। বেঁচে থাকলাম শুধু আমি।"

আমার মা বললো "তুই যখন বাঁইচে রয়েছিস। তুই চলে যা বেঁচে থাকলে দেখা হবে বলে আমার মা আমাকে গাঙ্গে ফেলে দিল।" আমি সাঁতার দিলাম। অজ্ঞান অবস্থায় আমি নদী পার হয়ে ওপারে চলে এলাম। একটি পরিবার আমাকে আশ্রয় দিল। আমি তিনদিন ঐ জায়গায় থাকলাম। তারপর একটু সুস্থ হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেলাম।



কুসুম বৈরাগী
স্বামী : রুক্মিণী বৈরাগী
বয়স : ৬০
পেশা : গৃহিণী
গ্রাম : আউশখালী
ডাকঘর : কাঞ্চননগর
থানা : বটিয়াঘাটা।

'৭১-এ আমি একজন গৃহিণী। সাতক্ষীরার দিক থেকে পাকসেনারা চুকনগর এসেই গোলাগুলি শুরু করে। লোকজন তখন কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ বিভিন্ন জায়গায় শুয়ে পড়ে। আমার কোলে তখন আমার ৫ মাস বয়সী বাচ্চা। ভয়ে পালাতে গিয়ে বাচ্চাটা কোল থেকে পড়ে যায়। কান্নার আওয়াজ শুনে তাকে আমি খুঁজে পাই। সে বাচ্চাও পরে মারা যায় ভারতে যাওয়ার পর।

পাকসেনারা আমার স্বামীকে গুলি করে। ছেলে কৃষ্ণপদকে যখন গুলি করলো তখন সে আমার পাশে শোয়া ছিল। ভেবেছিলাম ছেলে বেঁচে আছে। "ছেলের গায়ে ঢুশ দিলাম। ওরে ক'লাম আইয়ে যা, সে উঠিলো না, শুয়ে থাকিল।" তার পেটের ভেতর দিয়ে গুলি ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

সেদিন ওরা আমার স্বামী এবং ছেলেকে ছাড়া বোনের ছেলে মান্দার এবং মেয়ে জামাই দিনদয়ালকে মেরেছিলো।

বর্তমানে আমার মেয়ে ছাড়া কেউই বেঁচে নেই। আমার স্বামী, ছেলে এবং আত্মীয়-স্বজনের হত্যাকারীদের বিচার আমি অবশ্যই চাই।



রাজকুমার রায়
পিতা : সহদেব রায়
বয়স : ৬০
পেশা : কৃষিকাজ
ঠিকানা : খড়িবুনিয়া।

১৯৭১ সালে আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। সরকারের সহযোগিতায় স্থানীয় কিছু মুসলমান আমাদের সবকিছু লুটতরাজ শুরু করে। চুকনগরে গুলির আগে তো আমাদের কিছু ছিল না। তখন আমাদের বাধ্য হয়ে ইন্ডিয়া যাওয়া ছাড়া কোন পথ ছিল না। তাই আমরা চুকনগর চলে এলাম। বুধবার দিন বিকালে সবার সাথে খড়িবুনিয়া থেকে শেয়ারে নৌকা পথে এখানে আসি। নৌকাতে ফ্যামিলিসহ চাল-ডাল-চিড়া এসব কিছু ছিল। হাইস্কুলের পাশে নৌকা লাগায়ে

রেখে আমার ও ভাইয়ের ফ্যামিলির লোকজন একটা বাঁশঝাড়ের গোড়ায় রান্না-বান্নার আয়োজন শুরু করে। আমার স্ত্রী চান-টান করে রান্না তুলে দেবে আর কি। আর আমি বাচ্চাটা কোলে নিয়ে বসে সেই অবস্থায় গুলির শব্দ শুরু হয়ে যায়। স্থানীয় কিছু লোক বললো—আগের দিন চেয়ারম্যান বাড়ি লুট-টুট হয়েছে, ওরকম কিছু হবে তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমরা রান্না-বান্না করে খাও।

৫০ হাত দূর থেকে দেখতে পাই একটা আম গাছের তলায় মেলা লোক। সেখানে কিছু সৈন্য একটা লোক হাত জোড় করে কিছু বলছে। ওরা (আর্মি) ঐ ঝাঁকের ভেতর দাঁড় করায় দিল। লোকট পটপট চারদিকে দৌড়ে পালাতে যায়। ঐ দৃশ্য দেখে চিন্তা করলাম আমাদের কি উপায়।

তখন বেলা একটা-দেড়টা বাজে। সৈন্যরা গুলি করতে করতে আসতে থাকে। লোকজন ভয়ে ছোটাছুটি করছে। আমরা পাশের একটা বাড়িতে যাই। খোকাটা আমার কোলে। তিন বছর বয়স। আর মেয়েটা ৬-৭ দিন বয়স। ওর মার কোলে ছিল। ছোট ঘর, অনেক লোকজন। ছেলেপেলে-বাচ্চা-কাচ্চারা সব কান্নাকাটি করছে। আমার ওয়াইফ বললো এখানে থাকা যাবে না। এভাবে কান্নাকাটি করলে ওরা এখানে চলে আসবে। আমরা সেখান থেকে নদীর সাইডে চলে যাই। চারিধারে 'শব্দাশব্দি'র মাঝেই আমরা চিড়ে-চাউল, টাকা-পয়সা, সোনা-গয়না সবকিছু ফেলে দিয়ে ওপারে যাই। বহুদূর যেয়ে লোকজনকে বললাম আমাদের একটু জায়গা দাও। বললো—'তোমাদের মালাউনের জন্য কি করবো আমরা? হবে না, তোমরা যেহানে পার চলে যাও।'

বহুদূর হেঁটে সন্ধ্যার পর পালপাড়ায় পালের বাড়িতে গিয়ে আমাদের 'দৃশ্য' দেখে খাবার-দাবার দিল। আমাদের ইন্ডিয়া যাবার 'কায়দা' নেই, টাকা-পয়সা নেই, চাল নেই, চিড়া নেই—কি কইরে যাব। তাই আবার শুকনা পথ দিয়ে দেশে চলে যাই। মাছ-টাছ মাইরে খাইয়ে-দাইয়ে কোনমতে চলে আসা হয়েছে। শোনা যায় আমাদের গ্রামের অন্তত ২০ জন লোক চুকনগরে মারা যায়।



জগদীস দাস
পিতা : ভাগীরথ দাস
বয়স : ৫৮
পেশা : কৃষিকাজ
গ্রাম : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

সে সময় ('৭১)-এ আমি কৃষক হিসেবে বেশি পরিচিত থাকলেও গ্রামের বাজারে দিনমজুরির কাজও করতাম। তখনও আমরা কাজ করছিলাম। দেখলাম বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন চুকনগর

বাজার এবং তৎসংলগ্ন জায়গাগুলোতে ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নৌকা করে লোকজন এসে জড়ো হচ্ছিলো। ঘটনার দিন অর্থাৎ ৫ মে বৃহস্পতিবার সকালে পাকসেনারা গাড়িতে করে এখানে এলো এবং এসেই গুলি করতে থাকে। তখন চুকনগর গ্রামের পাথারখোলা মাঠ, নদীর ঘাট, চুকনগর বাজারসহ প্রায় সব জায়গায় লোকে লোকারণ্য ছিল। এ অবস্থায় লোকজন বিভিন্ন দিকে দৌড়িয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করায় আমার স্ত্রী, মা, ভাই কোথায় গেল জানতে পারিনি। পরে আমিও পেছন দিক থেকে দৌড়ে এক জায়গায় আশ্রয় নিলাম।

বাবা যাচ্ছিলো আমার বড় ভাই অন্য বাড়িতে থাকে, তাকে বলার জন্য। রাস্তায় পাকসেনারা তাকে গুলি করে। "বাবা যেভাবে ওদের পা'টা জড়ায়ে ধরতি গেছিল, ঐভাবেই তাকে গুলি করে এবং তার পেটের একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে গুলি বাইর হয়ে যায়। বেশ খানিক দূরে যাইয়ে সেই রক্তটা জমা হইল।" এবং সাথে সাথেই তিনি মারা গেলেন। সেদিন ওরা ঘুরে ঘুরে চুকনগর বাজার, কালীতলা, বারালিতলা, নদীর পাড়ে গাছের শিকড়ের নিচে আশ্রয়প্রার্থী লোকদের, গাছে উঠেছিল যারা তাদেরকে, নৌকায় ছিল যারা তাদেরকে গুলি করে মারে।

সেদিন যাদের কেউ নদীতে সাঁতরিয়ে ওপাড়ে চলে গিয়েছিলো, কেউ পানা-পুকুরে ডুব দিয়ে নাক বের করে রেখেছিলো তারাই কোনোভাবে বেঁচে যায়।

পরবর্তীতে আমি সন্ধ্যা সাতটা-আটটার দিকে বাড়িতে আসি মা, ভাই এবং স্ত্রীর খোঁজে। এসে দেখি বাবা পড়ি রইয়েছে। আমাদের গ্রামের ছেলে কালাচাঁদ, দিগম্বর পড়ি আছে। "বাবাকে নাইড়িয়ে দেখলাম সে শক্ত হইয়ে গেছে। আমার পরিবারের কারো পালাম না। কেডা কোথায় গেছে তার কোন নির্ণয় নাই। ঐভাবে রাতে গিয়ে থাকলাম পাশের এক গ্রামে। সেখানে গিয়ে মা-দের জন্য কানতি-টানতি নিলে গ্রামবাসীরা লাঠি-ঠেঙ্গা নিয়ে আইসেছে, "যে তুই যদি কান্দিস তাহলে পাকসেনারা এইখানে গুলি কইরে দেবে, আমরা তো সব মারা যাব।"

পরদিন সেখান থেকেই স্ত্রী, মা, ভাইদের খোঁজ পাই এবং তাদের নিয়ে ভারতে চলে যাই।



সন্তোষ দাস
পিতা : ঈশ্বর ভাগীরথ দাস
বয়স : ৫৫
পেশা : শিক্ষকতা
গ্রাম : পুটিমারি
ডাকঘর : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

'৭১ সালে আমি সবেমাত্র পড়াশোনা শেষ করেছি।

চুকনগর গণহত্যার দিন আমি সেখানেই ছিলাম। তারিখটা ছিল ২০ মে বৃহস্পতিবার।

গণহত্যার প্রায় সপ্তাহখানেক পূর্ব থেকে লোকজন চুকনগর এসে জড়ো হচ্ছিল। এরা বেশিরভাগ ছিল নিচু এবং আবাদ অঞ্চলের লোক।

স্বাধীনতা বিরোধীরা লোকের ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব হচ্ছে, সন্ধ্যা হতেই বিভিন্ন বাড়িতে এসে উত্যক্ত করছে। চিঠি দিয়ে হুমকি দিচ্ছে এ পরিস্থিতিতে এলাকায় থাকা দুর্বিষহ ছিল। তাছাড়া গণহত্যার দিন সকাল সাতটায় আমার বড় ভাই সুদীপ এবং মেজ ভাই জগদীশ এরা কিছু টাকার বিনিময়ে ভ্যানে কেশবপুরের মধ্য দিয়ে ভারতে লোক পৌঁছে দেবে বলে ঠিক করে। বেলা আটটার মধ্যে নৌকা করে লোক এসেছিলো। চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে। প্রায় পাঁচশ বিঘা সম্পত্তি জলে পূর্ণ।

ঘটনাস্থলের খুব কাছেই আমাদের বাড়ি। ঘর থেকে বের হয়ে দেখি দুটো গাড়ি সাতক্ষীরার দিক থেকে এলো। প্রথমেই আমার সামনের বাড়িতে পাকসেনারা ঢুকলো। সেখানে চিকন মোড়ল নামে একজনকে গুলি করলো। তখনই আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকে বাবাকে বললাম, 'বাবা এখানে আর থাকা সম্ভব না। ঘরের দরজায় তালা দিয়ে আমার স্ত্রী, ভাইয়ের স্ত্রী, মা, বাবাকে নিয়ে বিলের মধ্যে ঝাঁপ দিব, আমরা তিনজন বসছি জলে নামার জন্য, আর বাবা বসতে পারেনি। এই সময় পেছনে থেকে বাবাকে গুলি করলো। সঙ্গে সঙ্গে বাবা জলের মধ্যে পড়ে গেল। আর কোনো কথা বলতে পারেনি।' বাকি তিনজনকে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিলাম। তারা ভয়ে জড়িয়ে ধরলো। "আমার স্ত্রী ও ভাইয়ের স্ত্রীর গায়ে পেটিকোট ছাড়া শাড়ি-ব্লাউজ সব জলে ভেসে যায়। তখন ওদেরকে বললাম, মাথায় কাদা দিতে। যাতে কালো চুল না দেখে। শুধু মুখ এবং নাকটা উপরে থাকবে। বাবার রক্ত আমার গায়ে লাগছে। কিছুতেই বাবাকে ধরতি পারতিছি না। বাবা চলে গেল। সে সময় পাকসেনারা বিলের ধারে বসে মাথা লক্ষ্য করে গুলি করছে। তখন আমরা সাঁতরিয়ে বহুদূরে নদীতে চলে যাই। সেখান থেকে দেখলাম পাকসেনারা আমাদের পাড়ার ভেতরে যারা ছিল তাদেরকে মারে এবং পরে "চুকনগর বাজারে গুলি করতে করতে কবুতরের মতো মানুষ মাইরি ফাইলি রাখে। তাছাড়া বড় বড় কয়েকটা হিন্দু বাড়িতে আগুন ধরাইয়ে দেয়। আগুনে বাড়িঘর ছাড়া নারকেল গাছ, বাঁশঝাড় সব পুইড়ে যায়।"

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সাঁতরিয়ে বাড়িতে চলে এলাম। দেখলাম বাড়িতে কোনো মালামাল নেই। যেখানে সেখানে শুধু মানুষের লাশ পড়ে আছে। কালীবাড়ির দিকে এক মাকে তার মায়ের কোলে বাচ্চা দুধ খাওয়া অবস্থায় গুলি করে। তারপরও বাচ্চা তখন মায়ের দুধ খাচ্ছিলো। এভাবে সেদিন ওরা চুকনগর বাজার, রায়পাড়া, চুকনগর বাজারের পাশে এসব এলাকায় ঢুকে লোকজনকে গুলি করে।

সে সময় আমার বাবা মারা গেছে। "আমি চাই যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিচার হউক, তাহলে আমার ব্যাথাটা কিছুটা হলেও লাঘব হবে।"



দেবলা বৈরাগী
স্বামী : কৃষ্ণপদ বৈরাগী
বয়স : ৪৭
পেশা : গৃহিণী
গ্রাম : আউশখালী
ডাকঘর : কাঞ্চননগর
থানা : বটিয়াঘাটা।

'৭১ সালে আমি একজন গৃহবধূ। সবে আমার বিয়ে হয়েছে। তিন মাসের গর্ভবতী। এ অবস্থায় সেদিন আমাকে চুকনগরে যেতে হয়েছিলো।

তখন আমাদের এলাকার পরিস্থিতি ভাল ছিল না। চারদিকে লুটপাট হচ্ছে। লোকজন ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তখন আমি, আমার শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী ও আত্মীয়-স্বজন একত্রে চুকনগরে পৌছি ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

চুকনগর বাজারের পূর্বদিকে আম বাগানের ভিতরে আমরা আশ্রয় নিলাম। শরীর খারাপ লাগছিলো বলে "স্বামীর মাজার উপর শুয়েছিলাম। আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে তাকে গুলি করলো।" কোমরের পাশ দিয়ে গুলি ঢুকে অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। "আমি বললাম যে আমাকে গুলি করেন। বললো, তোমাদের পরে ব্যবস্থা হবে। তোদের দেশে যেয়ে শাদী করা হবে।"

সেদিন সেখানে আমার স্বামী ছাড়াও শ্বশুর, ঠাকুর জামাই এরা মারা যায়। প্রায় দুই-তিন হাজার লোক চুকনগর গণহত্যায় মারা গিয়েছিলো।

পরবর্তীতে ওরা চলে যাওয়ার পর আমার মামা আমাদেরকে ভদ্রা নদী পার করে বিকেল পাঁচটার দিকে ওপাড়ে কাঁঠালতলার মোড়ে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আমরা ভারতে চলে যাই। সেখানেই পরবর্তীতে আমার মেয়ের জন্ম হয়। আমি মেয়ে জামাইর বাড়িতে থাকি। নিদারুণ কষ্ট করে দীর্ঘ ৩০ বছর কাটাতে হয়।

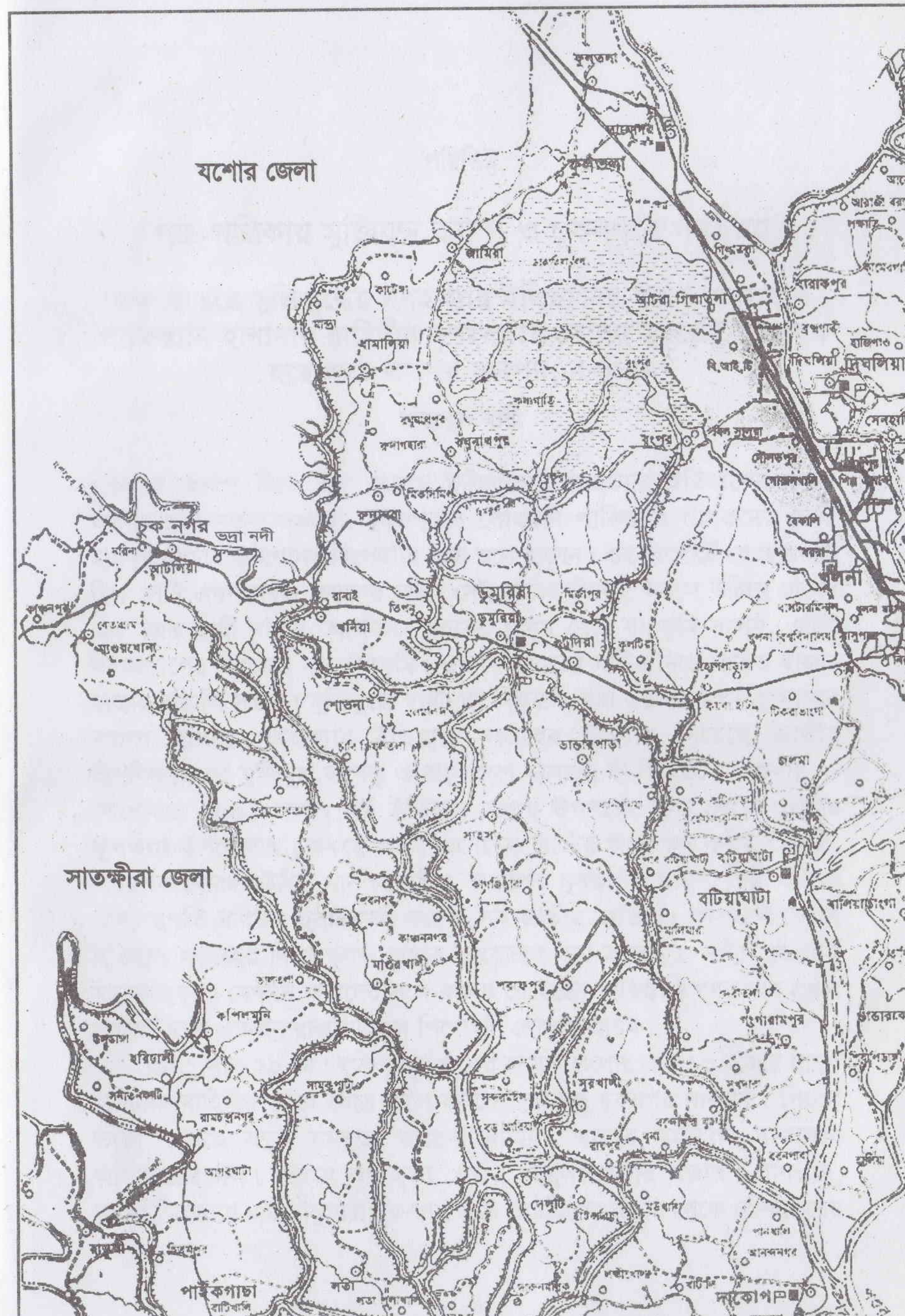


শহরজান বিবি
পিতা : গহর সর্দার
বয়স : ৪৫
পেশা : অন্যের বাড়ি ছুটা কাজ
গ্রাম : চুকনগর
থানা : ডুমুরিয়া।

আমার স্বামী বেঁচে নেই। আমি পরের বাড়ি কাজ করি। ঘর ঝাড় দেই, পানি-টানি আনি, চাল-কুড়ো

বানায়ে দেই এসবই করি। ছেলে আছে 'দুডো'। তারা খেতে দেয় না। 'তাইগো জমিজমা নেই, আমারে খাইতে দেবে কোন্তে।' সে সময় ('৭১ সালে) আমার স্বামী রংপুরের সাহাপুরে কাজ (কৃষিকাজ) করতে গিয়েছিলো। জ্যৈষ্ঠ মাসের কোন এক বৃহস্পতিবার খানসেনারা চুকনগর এসে অনেক মানুষ মেরে ফেলেছে। রাত্রিতে আমরা ভালো মানুষ খাইয়ে যাইয়ে শুয়েছি। সকালে দেখি যে বাজার ভর্তি হয়ে গেছে ছিয়ানব্বুই গ্রামের মানুষে। তারা সব ইন্ডিয়া, ভারত যাবে। এইখানে একটা খাল আছে—সেই খালটা নৌকো আর মানুষে ভরে যায়। আমাদের 'বিটারা', ছেলেমেয়েরা আনন্দ করতে করতে গিয়েছিলো সে নৌকো আর মানুষজন দেখতে। সেই জায়গা থেকে ওরা দৌড়াতে দৌড়াতে আসলো। চারিদিকে মিলিটারি ঘেরাও করে ফেলছে। যুদ্ধের আগে তো মিলিটারি দেখি নাই, ওরা তো কারো সাথেই জিজ্ঞাস করে লড়াই করলো না। 'ঐ ওরা এহেলাই মার মাইরলো।'

"আমার দুডো ছাওয়াল ও মাইয়েডা (১১ বছরের) সাথে নিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে সব ভাইঙ্গে-চুইরে চুকনগরের বদর চেয়ারম্যানের দালানের মধ্যে এসে পালালাম।" চেয়ারম্যানের বাড়ি যেয়ে জানালা-দরজা সব বন্ধ করে দিয়ে ছিলাম। খানসেনারা বাড়ি ঘেরাও করে বললো এখানে কোন মোসলমান থাকলে নারায়ে তাকবীর বলে বার হও। কিছু মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়ায়ে ছিলো। আমার 'মাইয়েডা' একসময় ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছিল ওরা (মিলিটারি) চলে গেছে কিনা। তা ঐ জানালার ফাঁক দিয়ে গুলি করে দেয়। খানিক সময় বেঁচে ছিল। আমরা যে দেখবো, চেষ্টা করবো এমন কোন কায়দা ছিল না। "কারে দ্যাকপো। ঐ ঘরের মধ্য থেকে টাইনে বার করে উঠানে এনে থুয়ে দিলাম।" পরিস্থিতি এমন খারাপ। তাঁতিপাড়ায়-টারায় আগুন ধরিয়ে দিল। লুটপাট হচ্ছিলো। মানুষজন পানির মধ্যে, গাছের মধ্যে, ঘাটে, সিঁড়ির মধ্যে যে যেভাবে পারে বাঁচার জন্য পালিয়েছিলো। "একদল মানুষ এসে মাইয়েডারে বাজারে ডাক্তার বাড়ি নিয়ে গেল। সেখানে কী আর ডাক্তার পাওয়া যায়? মাইয়েডা আমার মইরে গেলো। ওর এক চাচা ঘাড়ে করে ঐ অত রাত্তিতে হারিকেন ধরিয়ে একা মাটি দিয়ে আসলো। আর কোন মানুষ আসলো না। 'তাতে মা'গো আমি এহেবারে জ্যান্ত না। আমি ঘুইরি বেড়াই আইধমরার মত। পয়লা মাইয়েডা আমার, ম্যালা দরদের মাইয়ে আমার। আমি আজ যে এ জাগায় আইছি আমার আত্মায় কচ্ছিল না আসতি। তখন কোলের দুডো বাচ্চা তাদের বাঁচাইতে হবে ভারতে টুকু কালাম সাহেবের বাড়িতে যেয়ে থাকি। সেদিন ঐ বাজারে, গাঙে অনেক মানুষ মরিল। নিজেই দেখেছি গাঙে উপুড় করে করে মাছের মত করে মানুষ ফেলানো ছিল। যে রকম ঘুঘু মারে, পাখি মারে সে রকম মেরে মেরে গেছে। দশটার সময় গাড়ি এসেছে আড়াইটা-তিনটা পর্যন্ত বোধহয় মেরেছে। মেরে তাদের মত করে চলি গ্যালো। এই যে মানুষগুলো যারা মেরে ফেললো তাদের বিচার চাবো না? আমার বাচ্চা মাইরে ফেলাইলো, আমি বিচার না চাইয়ে পারি?"



যশোর জেলা
সাতক্ষীরা জেলা
চুক নগর
ভদ্রা নদী
ডুমুরিয়া
বটিয়াঘাটা
পাইকগাছা
দাকোপ
দিঘলিয়া

পরিশিষ্ট

পত্র-পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প ও চুকনগরে গণহত্যা

শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যার ইতিহাসের স্বরূপ অনুসন্ধান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতায় সেদিন মুহূর্তেই চুকনগর হয়ে ওঠে লাশের জনপদ, বধ্যগ্রাম

ফজলুল বারী

চুকনগর ক্যাম্প দিয়ে শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যার ইতিহাসের স্বরূপ অনুসন্ধানের নতুন অধ্যায়। চুকনগরের লোকজন পাকিস্তানি শাসকদের তৈরি হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টের কথা শুনে হাসেন। ওই রিপোর্টে যে জায়গাটি ছিল সেটি এখন সবুজ ফসলের মাঠ। সেই মাঠের দিকেই আঙ্গুল উচিয়ে গ্রামের এক বয়স্ক চাষী বলেন, আপনারা শহরের মানুষ যেটা বধ্যভূমি বলেন, এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি। এখানেই মাঠের মাটির নিচে শায়িত হাজার হাজার বাঙালি সন্তান। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিজয়ের প্রায় ৩০ বছর পর চুকনগরে ক্যাম্প বসিয়ে গণহত্যার ইতিহাস সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট। শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০০০ সাল। এই ইতিহাস সংগ্রহ উপলক্ষে ঢাকা থেকে খুলনার ফুলতলা উপজেলার চুকনগর গ্রামে এসেছেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শিল্পী হাশেম খান, স্থপতি রবিউল হুসাইনসহ বরেণ্য সব জাতীয় ব্যক্তিত্ব। কাকতালীয়ভাবে ইতিহাস সংগ্রহের দিনে খুলনা শহরে আয়োজন করা হয়েছে ৪ দলীয় জোটের মহাসমাবেশ। যেখানে অন্যদের সঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন পাকিস্তানি গণহত্যার প্রধান সহযোগীদের একজন রাজাকারকূল শিরোমণি গোলাম আযম।

১৯৭১ সাল ২০ মে। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের কয়েক জেলার প্রায় ১০ হাজার মানুষ হানাদার বাহিনীর তাড়া খেয়ে এসে সমবেত হয়েছে চুকনগর বাজারে। পিছনে তাড়া করেছে সম্মুখ যমদূত, হায়েনা বাহিনী, তাদের সহযোগী রাজাকার আলবদরের দল। পিছনে শুধু মৃত্যু, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের প্রতাপ। প্রাণভয়ে, সম্ভ্রমহানির ভয়ে এই মানুষেরা চুকনগর এসে উঠেছিলেন এখান থেকে কেশবপুরের

গ্রামের ভিতর দিয়ে ভারতে পাড়ি জমানোর উদ্দেশ্যে। এলাকাটি খুলনা শহর থেকে প্রায় ৩২ কিঃ মিঃ পশ্চিমে, খুলনা-সাতক্ষীরা সড়কের পাশে। ১৮ মে থেকে লোকজন আসতে শুরু করে। ২০ মে সকাল নাগাদ তাদের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। বাজারের পাশে, এখানে সেখানে নিদ্রাহীন ক্লান্ত মানুষগুলো বিশ্রাম নিচ্ছিল। কেউবা ব্যস্ত ছিল রান্না-খাওয়ার আয়োজন প্রস্তুতি নিয়ে। রাজাকাররা তাদের বাপ পাকিস্তানি বাহিনীকে খবর দেয়। তিন গাড়ি বোঝাই হায়েনা বাহিনী পৌঁছে যায় চুকনগরে। নিরস্ত্র মানুষগুলোর ওপর বেপরোয়া গুলি করতে করতে হায়েনা বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। যাকে যেখানে সামনে পেয়েছে তারা গুলি করেছে। বিলের মাঝে ঘেরাও অবস্থায় গুলি করে হত্যা চলে। গ্রামে ঢুকে হত্যা চলে, নদীর তীর ধরে চলে গণহত্যার বিভীষিকা। সকাল ১০ টা-সাড়ে ১০ টা থেকে ৪/৫ ঘণ্টা চলেছে এই গণহত্যা। মুহূর্তে চুকনগর হয়ে যায় লাশের জনপদ। বধ্যগ্রাম। লাশের ওপর লাশ, মায়ের কোলে শিশুর লাশ, স্বামীকে বাঁচাতে স্ত্রী জড়িয়ে ধরেছিল। বাবা মেয়েকে বাঁচাতে জড়িয়ে ধরেছিল। মুহূর্তে সবাই লাশ হয়ে যায়। ভদ্রা নদীর পানিতে বয় রক্তের নহর, ভদ্রা নদী হয়ে যায় লাশের নদী। কয়েক ঘণ্টা এমন গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানিদের গুলির মজুদ ফুরিয়ে গেলে তারা চলে যায়। দূর থেকে যারা দেখেছে এই ভয়াবহ গণহত্যার বিভীষিকা, পাকিস্তানি সৈন্যরা চলে গেছে দেখে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। তাঁদের বেশ কয়েকজন মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ইনস্টিটিউটের অনুসন্ধানকর্মীদের কাছে শুক্রবার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁদের গণহত্যা দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বলেছেন—তখন লাশ, রক্ত ছাড়া আর কিছু কোথাও ছিল না পুরো চুকনগর এলাকায়। আহতের গোঙানির শব্দ, আহাজারি ছাড়া কিছুই শোনা যায়নি। গুলিতে যাঁরা মরেনি তাদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তারপরও যাঁরা মরেনি তাদের আহাজারির শব্দে পালিয়ে গেছে এলাকার সব পশুপাখি। কয়েকজন বললেন, ৪২শ' পর্যন্ত লাশ গুনেছেন। গুনতে গুনতে পরিশ্রান্ত হয়ে লাশ গোনা বাদ দিয়েছেন। ভদ্রা নদী দিয়ে যেমন কচুরিপানার বহর যায় তেমনি ভেসে গেছে লাশের বহর। নদী দিয়ে যে কত লাশ ভেসে গেছে তা গোনাই সম্ভব হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ৩০ বছর পরও এই মানুষগুলো শিউরে উঠেছেন। বর্ণনা যাঁরা শুনেছেন শিউরে উঠেছেন তাঁরাও। বর্ণনা দিতে গিয়ে একেকজনের চোখ দিয়ে জলধারা নেমেছে। যাঁরা শুনেছেন তাঁরাও স্বজন হত্যার বেদনায় চোখের জল লুকাতে পারেননি। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে এর মাঝে মারা গেছেন। যাঁরা বেঁচে আছেন গণহত্যার লাশ গোনার অলিখিত ইতিহাস বলার জন্য যেন বেঁচে আছেন। একজন বলেছেন, এখনও অনেক রাতে আমি ঘুমাতে পারি না। চোখ বন্ধ করলেই লাশ আর লাশ দেখি। আবার লাশের স্তূপ দেখি। একাত্তরে চুকনগর বাজারে বাদাম বিক্রির পেশা ছিল ইয়াকুব আলী সরদারের। গোলাগুলি থেমে যাবার পর তিনিও লাশের স্তূপ দেখতে গ্রামে ঢুকেছিলেন। ইয়াকুব আলীর

সঙ্গে শুক্রবার কথা বলার সময় হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট ব্যাখ্যা করে বললে তিনি হাসেন। বলেন, ২৬ হাজার মানুষ মেরেছে তারা হিসাব করে; আমাদের এখানেই তো মেরেছে ১০ হাজারের বেশি।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চুকনগর নেই!

শুক্রবারের তথ্য সংগ্রহ ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চুকনগর কলেজের অধ্যক্ষ এবিএম শফিকুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির বক্তব্যে তিনি খেদোক্তি উচ্চারণ করে বলেন—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ১৫ খণ্ডের ইতিহাসের কোথাও চুকনগরের গণহত্যা প্রসঙ্গ স্থান পায়নি। শফিকুল ইসলাম বলেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধে একসঙ্গে ১৬শ' মানুষ হত্যার বিষয়টি সারা পৃথিবীতে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড হিসাবে আলোচিত হয়। কিন্তু চুকনগরে ৪২শ' পর্যন্ত লাশ গুণে সংশ্লিষ্টরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। শফিকুল ইসলাম খুলনার সাংবাদিকদের প্রশংসা করে বলেন, তাঁরাই প্রতিবছর ২০ মে চুকনগর গণহত্যার রিপোর্ট লিখে লিখে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্র তৈরি করেছেন।

স্বাগত ভাষণ

মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবৈতনিক পরিচালক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি আবার জোরেশোরে উঠতে শুরু করেছে। এই বিচারের জন্য সাক্ষী-সাবুদ প্রয়োজন। চুকনগর গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী, শিকারদের সাক্ষ্য বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। মুনতাসীর মামুন বলেন, মুক্তিযুদ্ধের বিরল অনেক ইতিহাস, নথিপত্র আজও সংগ্রহ করা হয়নি। সংগ্রহ করা যায়নি। জাদুঘরে যেসব নথিপত্র আছে সেগুলোও প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় না। মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িতদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে অলিখিত ইতিহাস সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে। চুকনগর এই ইতিহাস গ্রন্থনার প্রথম ক্যাম্প। মামুন বলেন, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চিহ্নিত দেশের প্রধান ৮টি বধ্যভূমির চুকনগর একটি। কিন্তু এখানে কোন স্মৃতিসৌধ নেই। তিনি এ ব্যাপারে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নেবার আহ্বান জানিয়ে ৩০ লাখ শহীদের আত্মাহুতির তথ্য এড়াতে দাবি করা হয়েছে—পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে মারা পড়েছিল মাত্র ২৬ হাজার বাঙালি সন্তান। কিন্তু শুধু চুকনগরেই একদিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় হত্যা করা হয়েছিল প্রায় ৬ হাজার মানুষ। কোন স্মৃতিসৌধ, স্মারক স্তম্ভ এখানে নেই।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য, গবেষণা ইনস্টিটিউটর চেয়ারম্যান অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর শুক্রবারের অনুষ্ঠানের সময়ানুগ চমৎকার

একটি বক্তৃতা দেন। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, আজ এই বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে আমার ক্রোধ হচ্ছে, আমার কান্না পাচ্ছে। এ মাটিকে আমার সালাম। জনাব জাহাঙ্গীর বলেন, পাকিস্তান একটি পাপ। এ পাপের সঙ্গে জড়িতরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র, মুক্তিযুদ্ধের অর্জন নস্যাত করতে আজ একজোট হয়েছে। আমাদের ঘোষণা করা উচিত আমরা এই পাপের সঙ্গে কোনভাবেই সহযোগিতা করব না। যেখানে পাকিস্তানি পাপের ছায়া মিলবে সেখানেই প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। এই প্রতিরোধের মাধ্যম হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। মানুষের হৃদয় থেকে আমরা সেই দুঃসহ দিনগুলির কথা তুলে আনব। ইতিহাস আকারে তা ছড়িয়ে দেব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে। যারা মুক্তিযুদ্ধকে একটি সাময়িক ঘটনা বলার ধৃষ্টতা দেখায় তাদের বিরুদ্ধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবাদ সৃষ্টির ব্রত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সভ্যতার বোধকে জাগ্রত করা। আমরা সেটাই করছি। সভ্যতা না থাকলে থাকবে শুধু বর্বরতা। আমরা সভ্যতা চাই, বর্বরতা চাই না। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, যারা মানুষ হত্যা করেছে এখনও হত্যার রাজনীতি প্রচার করছে তারা জাতির শত্রু। শত্রুর নাম উচ্চারণ করতে দ্বিধা করলে এই বধ্যভূমির মাটির সঙ্গেই বেঈমানী করা হবে। আমরা বেঈমান হবো না।

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বিশেষ অতিথির ভাষণে বলেন, চুকনগর ক্যাম্প জাতীয় কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে রাখা। বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা যেন আমরা ধরে রাখতে পারি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল এ দেশ হবে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধতামুক্ত বাংলাদেশ। চুকনগরের মাটির সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মের মানুষের রক্ত, অস্থিমজ্জা মিশেছে তা যেন আমরা ভুলে না যাই। খুলনা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ শচীন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন, কারও কারও ধারণা মুক্তিযুদ্ধের সময় যাঁরা ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা নিরাপদে আরাম আয়েশে ছিলেন। দেশান্তরী অবস্থায় রোগে শোকে শরণার্থী শিবিরের জীবন যে ছিল কত কষ্টের তা শুধু ভুক্তভোগীরাই জানেন।

কালাদাসীর কপালে গুলির দাগটি এখনও মুছে যায়নি, খসে পড়েছিল সিঁদুরের টিপ

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি : কালাদাসী রায়ের (৫৫) কপালে গুলির দাগটি এখনও মুছে যায়নি। একাত্তরের চুকনগরে স্বামী হারিয়ে সিঁদুরের টিপ খসে পড়েছিল। নিজের কপালে গুলির আঘাতের চিকিৎসা হলেও কালাদাসীর চোখ গেছে। ছেলের বউ করুণাময়ীকে নিয়ে শুক্রবার মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহের ক্যাম্পে তিনি এসেছিলেন। করুণাময়ী চুকনগরের মাঠের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এই মাঠে মিশে

গেছে তারও অনেক স্বজনের লাশ। কালাদাসী করুণাময়ীদের মতো আরও অনেকে শুক্রবার সেখানে এসেছিলেন।

শহীদ কার্তিকচন্দ্র রায় ছিলেন কালাদাসীর স্বামী। বৃষ্টির মতো গুলি হচ্ছিল ভদ্রা নদী তীরকে লক্ষ্য করে। একটা নৌকায় পরিজন নিয়ে পালাচ্ছিলেন কার্তিক চন্দ্র। গুলি এসে লাগে তাঁর বুকে। কালাদাসী স্বামীর দেহ নদীতে পড়ে গেছে দেখে চিৎকার করছিলেন। কিন্তু তাঁর আর সেদিকে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। গুলি এসে লাগে কপালে দুই ভ্রুর ঠিক মাঝখানে। আর কিছুই জানেন না তিনি। ভারতে শরণার্থী ক্যাম্পে চিকিৎসা হয় তাঁর। কপালের ক্ষত সারে। কিন্তু চোখের দ্যুতি আর ফেরে না। কপাল তো আগেই পুড়েছে কালাদাসীর। স্বামী হারিয়ে গেছে ভদ্রা নদীর স্রোতে। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে নতুন সংগ্রাম শুরু করেন। একবার ৯শ' টাকা সরকারি সাহায্য পেয়েছিলেন। আর কিছুই কোন দিন পাননি। অরবিন্দ দাসের ঠাকুরদাদা দিগম্বর দাস, পরিবারের সদস্য বেচু রাম, কালাচাঁদ, মার্তা দেবী এরা সবাই শিকার হয়েছেন চুকনগর গণহত্যার। লাইনে অরবিন্দকে দাঁড় করানো হয়েছিল। কিভাবে যে বেঁচে গেছেন তা মনে নেই। অরবিন্দও শুক্রবার এসেছিলেন চুকনগর ক্যাম্পে। বললেন, এখানে এত লোক মরেছে যে কোন বাড়িই তখন শোকছাড়া ছিল না। হত্যাকাণ্ডের পর যারা বেঁচে ছিলেন তাঁদের প্রায় সবাই ভারতে চলে যান। অনেকে ফিরে এসেছেন। অনেকে আর আসেননি। অরবিন্দর বয়স এখন ৪৩/৪৪। কাঁকড়ার ব্যবসা করেন। বললেন মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর গণহত্যা তাঁদের গ্রামের মানুষের এত বেশি ক্ষতি করেছে যে তা কোনভাবেই পুষিয়ে নেবার ছিল না। কেউ তা চেষ্টাও করেননি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হারিয়ে যাচ্ছিল, এটাই ছিল গ্রামবাসীর দুঃখ।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ২০ মে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী একদিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় চুকনগরে প্রায় ৬ হাজার মানুষকে হত্যা করে। সেই গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য গ্রহণ উপলক্ষে শুক্রবার আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে চুকনগর কলেজের অধ্যক্ষ এবিএম শফিকুল ইসলাম বলেন, বর্বরোচিত ঘটনার শিকার লোকজনের বেশিরভাগ ছিলেন অস্থানীয়। এঁরা বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে চুকনগরে জড়ো হয়েছিলেন ভারতে পাড়ি জমাবার উদ্দেশে। সেজন্য এঁদের অনেকের নাম-পরিচয়ের হদিসও পাওয়া যায়নি। পরিজনদের অনেকে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। গণহত্যায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁদের অনেকে দেশেও ফিরে আসেননি। সেদিন প্রথম খুন হয়েছিলেন চুকনগরের চিকুন মোড়ল (৭০)। শুক্রবার এই গণহত্যার তথ্য সংগ্রহ অনুষ্ঠানে যেন ঘটেছিল একাত্তরের সম্মিলন। নানা বয়সের নারী-পুরুষ, শিশু, যুবা সবাই এসেছিলেন সেখানে। প্রবীণদের অনেকের মধ্যে দেখা-সাক্ষাত হয় বহু বছর পর।

দৈনিক জনকণ্ঠ ৯ সেপ্টেম্বর ২০০০

চুকনগর গণহত্যার তথ্য সংগ্রহের দ্বিতীয় দিনে খুলনা ভার্সিটিতে বিধবাদের মেলা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দিয়েই শত্রুদের পরাজিত করার আহ্বান

চুকনগর গণহত্যার তথ্য সংগ্রহের দ্বিতীয় দিনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবার যেন বিধবাদের মেলা বসেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় চলে সাধারণ মানুষের পয়সায়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও শনিবার মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পের তথ্য সংগ্রহ উপলক্ষে তার দরজা সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দিয়েছিল। একাত্তরের ২০ মে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগরে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার শিকার হয়ে যে প্রায় ৬ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগ বটিয়াঘাটা উপজেলা এলাকার মানুষ। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ও পড়েছে বটিয়াঘাটা উপজেলা এলাকায়। সেজন্য চুকনগর গণহত্যার তথ্য সংগ্রহের দ্বিতীয় এবং শেষ দিনের মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প খোলা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। শনিবার সেখানে গিয়ে দেখা যায় প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য দিতে। আগতদের বেশিরভাগই নারী। এবং তাদের প্রায় সবাই বিধবা। চুকনগরে পাকিস্তানি বাহিনী বেছে বেছে পুরুষ লোকজন, বিশেষত যুবকদের হত্যা করেছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এস এম নজরুল ইসলাম। মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবৈতনিক পরিচালক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন স্বাগত ভাষণ দেন। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী প্রধান অতিথি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় দু'দিন দু'শতাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য ধারণ করা হয়েছে অডিও ও ভিডিও সিস্টেমের মাধ্যমে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে এসব সাক্ষ্যপ্রমাণ কাজে লাগানো হবে। দু'দিনে ক্যাম্পে সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ স্বাধীনতার প্রায় ৩০ বছর পর তাদের খোঁজখবর নেবার ঘটনায় অভিভূত হয়েছেন। অনেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলেছেন, আমরা স্বজন হারিয়েও কোন বিচার পাইনি। আপনারা এসেছেন, আমাদের দুঃখের কথা শুনতে চেয়েছেন—আমরা বিচার পেয়ে গেছি।

কেন এই গণহত্যার ঘটনা

দু'দিনের অনুসন্ধানে চুকনগর গণহত্যার নেপথ্যের অনেক ঘটনা বেরিয়ে এসেছে। খুলনার বটিয়াঘাটা, বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জ, চিতলমারী ও বৃহত্তর বরিশালসহ ওই এলাকার সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয়ে বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিশেষত পাকিস্তানি বাহিনী গানবোটে ওই এলাকায় এসে বটিয়াঘাটার বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে হত্যা-অগ্নিসংযোগ শুরু করলে প্রাণভয়ে সংখ্যালঘুরা এলাকা ত্যাগ, দেশত্যাগের উদ্দেশ্যে নদীপথে চুকনগরে এসে জড়ো

হন। সেখান থেকে কেশবপুরের গ্রামের ভিতর দিয়ে তাঁদের সীমান্ত পাড়ি দেবার পরিকল্পনা ছিল। একাত্তরের ১৮ মে থেকে লোকজন চুকনগর পৌঁছতে শুরু করেন। ২০ মে সকাল নাগাদ এই সংখ্যা প্রায় লাখে পৌঁছে। কয়েকদিনের পথচলার ক্লান্তিতে পলায়নপর এসব পরিবার চুকনগর এলাকায় তখন বিশ্রামে ছিল। অনেকে রান্না-খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সড়কপথে যশোর থেকে অনেকে বাস-ট্রাকে করেও এসেছিল। স্থানীয় একজন সময় নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে এক অবাঙালি বাস চালকের কথা কাটাকাটি হয়। ওই চালক ফিরে যাবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে পাকিস্তানি সৈন্যরা সেখানে পৌঁছে। তাদের গাড়িতে অবাঙালি একাধিক ব্যক্তি ছিল—বলেছেন কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শী। একজন বলেন, ঘটনার কিছু আগে ঘোড়ায় চড়ে সাদা পাগড়ি পরা একটি লোক এসে এলাকা ঘুরে গেছে। সেও পাকিস্তানি বাহিনীর ইনফরমার হতে পারে। পাকিস্তানি বাহিনী এলাকায় পৌঁছেই মেশিনগানে ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। তারা যত ঘুরতে পেরেছে ততই বেশি বেশি নিরস্ত্র মানুষ ঢলে পড়েছে এখানে-সেখানে। তারা বাড়ির ভিতর ঢুকেছে। নদীর ধারে ছুটেছে। পাখির মতো গুলি করে মানুষ মেরেছে। বৃদ্ধ, শিশুরা অনেকে নদীতে ডুবে মরেছে। অনেকে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেখানেও ব্রাশ ফায়ারে মানুষ মারাতে পুকুরগুলো রক্তে লাল হয়েছে। হয়ে উঠেছে এককেটি বধ্য পুকুর। ছোট জায়গাটিতে গাদাগাদি করা মানুষজন প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে গিয়েও গুলির মুখে মরেছে বেঘোরে। পুরো চুকনগর হয়ে উঠেছে বধ্যগ্রাম। সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত পাকিস্তানিরা সরেনি। যাবার আগে আবার লাশ পরিষ্কার করার নির্দেশ দিয়ে গেছে। গণহত্যার বিভীষিকার সেই সময়েও চুকনগরে জন্ম হয়েছে বেশ কিছু শিশুর। অনেকে ওই অবস্থায় সদ্যোজাত শিশুটিকেও হারিয়ে ফেলেছে। অনেকে শিশুকে ফেলে রেখে অথবা হারিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে। চুকনগর গণহত্যা বটিয়াঘাটা এলাকায় সৃষ্টি করেছে অসংখ্য বিধবা নারীর। বটিয়াঘাটার একাধিক গ্রাম পুরুষশূন্য হয়েছে মানবজাতির ইতিহাসের সেই বৃহত্তম গণহত্যার ঘটনায়।

তিন বিধবা কুলবধূর কথা

করবী রায় (৫০), পুষ্পরাণী রায় (৪৮), স্বরস্বতী রায় (৪৭)—তিন বিধবা শনিবার এসেছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে। বটিয়াঘাটার কাতিয়ানাংলা গ্রামে তাঁদের বাড়ি। করবীর স্বামী নরেন, পুষ্পরাণীর স্বামী হরিভক্ত, সরস্বতীর স্বামী পবন চুকনগরে নিহত হন। একান্নবর্তী পরিবারের সব সদস্য একসঙ্গে দেশত্যাগের উদ্দেশ্যে ভারত রওয়ানা হয়েছিলেন। ১০ বিঘার মতো জমি ছিল পরিবারটির। দেশত্যাগে তাড়াহুড়ায় শেখ বাড়ির লোকজন দেই দিচ্ছি করে শেষ পর্যন্ত মাত্র ১শ' টাকার বিনিময়ে ওই জমি হাতিয়ে নিয়ে তাদের বিদায় করেছে। একাত্তরের ২০ মে দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। বুধবার সকালে পরিবারটি বাড়ি

থেকে রওয়ানা হয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে চুকনগর পৌঁছে। খাওয়া দাওয়ার প্রস্তুতি নিতে নিতে শুরু হয় গুলি। পরিবারের লোকজন এদিক-সেদিক প্রাণের মায়ায় ছুটে পালাতে গিয়ে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মেজ হরিভক্তের লাশ পড়ে প্রথমে। পুষ্পরাণীরা সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তার লাশ তুলতে তুলতে লাশ পড়ে নরেন, পবনের। পরিবারটি শোক আর ভীতিতে হতোদ্যম হয়ে কয়েকদিন এগ্রাম-সেগ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর ফিরে আসে নিজেদের গ্রামে। তিন বউ মিলে ভিক্ষা করে পরের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালায়। এভাবে তিনজন ছেলেপুলেকে বড় করেছেন। চুকনগরের ভয়াবহ স্মৃতি ধারণ করে বেঁচে আছেন এই তিন বিধবা নারী। শনিবার নিজের জীবনের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা শুধুই কেঁদেছেন। 'কেন যে গ্রাম ছাড়িলাম আর স্বামী হারাইলাম।' পুষ্পরাণী কেঁদে বলেন, 'আপনারা ঢাকা থেকে এসে আমাদের খোঁজ করিলেন। দুঃখের মধ্যে এমন আনন্দ অনেকদিন পাই নাইরে বাপ।'

সদ্যোজাত শিশুটির গল্প

চকরাখালীর কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস একাত্তরে খুলনা বিএল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। চুকনগরে গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী কার্তিক পরে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। কার্তিক একটি সদ্যোজাত শিশুর জন্মের বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে অশ্রুসজল করেন দুই চোখ। গণহত্যার বিভীষিকার মধ্যে শিশুটির জন্ম হয়েছিল। সেই প্রসূতির স্বজনরা ততক্ষণে মারা গেছেন। প্রসূতি তাদের জড়িয়ে ধরে বলেন, তাঁদেরও যেন সঙ্গে নেয়া হয়। কার্তিক তাঁর পরিবারের বয়স্ক লোকজন নিয়ে ছিলেন সমস্যায়। এই প্রসূতির দায়িত্ব কিভাবে নেবেন? তারপরও প্রসূতি রক্তাক্ত সদ্যোজাত শিশুকে বুকে নিয়ে টেনে হিঁচড়ে তাঁদের সঙ্গে চলতে শুরু করেন। এর মাঝে কার্তিকের ঠাকুর দাদা তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। কিছু পরে হঠাৎ তাকিয়ে দেখেন সেই প্রসূতির শিশুসন্তানও তাঁর কোলে নেই। আরও কিছু পর দেখেন সেই প্রসূতিও আর নেই তাঁদের সঙ্গে। কার্তিক এ সবের বর্ণনা বলতে বলতে চোখের জল লুকোছাপা রাখতে পারেন না। কার্তিক বলেন, কত লাশ যে মাড়িয়ে যেতে হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এখানে লাশ, সেখানে লাশ, নদীতে-পুকুরে শুধু লাশ আর লাশ। লাশের ওপর পড়ে তাঁরা বারবার হোঁচট খাচ্ছিলেন। রক্তে পিচ্ছিল পথে তাঁরা বার বার হোঁচট খাচ্ছিলেন। কার্তিক শুধু হতাশা প্রকাশ করে বলেন, এত লাশ, রক্তগঙ্গার বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েও আমরা কেন শান্তি পেলাম না।

চুকনগরের আরেক শিশু

চকরাখালীর মৃত অতুল চন্দ্র রায়ের বউ গুরুদাসী রায় (৭৭) চুকনগর গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তিনিও দেশ ছেড়ে পালিয়ে

যাচ্ছিলেন। বটিয়াঘাটার এই লোকজনের মুখে ভাষাটি মনে রাখার মতো। গুরুদাসী বলেন, স্বামী বলিল ছেলে মেয়ে নিয়ে এখানে আর থাকা যাবে না। আমরা চুকনগর গেলাম নৌকায়, সেখানে আমার ভাই বলরামের বউ পরবাসীর প্রসব বেদনা ওঠে। কাপড় দিয়ে ঘেরাওয়ের ব্যবস্থা করেছি। সেখানেই একটি মেয়ে বাচ্চার জন্ম হয়। কাপড় ছিঁড়ে নাড়ি বাঁধলাম, বাচ্চা নিয়ে উঠলাম কালী ঘরে। গোলাগুলির মধ্যে বাচ্চা হাতছাড়া হয়ে গেল। ভদ্রা নদী পেরিয়ে আমরা আশ্রয় নিয়েছি একটি গ্রামে। সেখান থেকে দশদিন পর বাচ্চা খুঁজতে আসি চুকনগরে। এক বৃদ্ধ বাচ্চাটিকে রেখে জ্যোস্না নাম দিয়েছিল। সেই জ্যোস্না এখন বড় হয়েছে। দুই বাচ্চার মা হয়েছে। চুকনগরের স্মৃতি বলতে গিয়ে গুরুদাসী বলেন—জলে গন্ধ হলো, গাঙ্গের মাছ সব মরে গেল। মাইয়া মানুষ তারা বেশি মারিল না। বেশি মারিল পুরুষ। সেই স্মৃতি এখনও কি মনে হয় মাঝে মাঝেই জিজ্ঞাসা করলে গুরুদাসী বলেন, লাশের ঘটনা মনে পড়িলে দেহকি থাকে প্রাণে? একথা বলে আবার চোখ মুছেন গুরুদাসী। চম্পারাণী, লতিফা গায়েন, বিলাসী বৈরাগী, অশ্বিনী কুমার মণ্ডলসহ আরও অনেকে বলেন, চুকনগরের ঘটনার বর্ণনা। তাতে শুধু লাশ আর লাশের কথা ছাড়া আর কিছু নেই। মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য পাপ ছাড়া আর কোন বৃত্তান্ত নেই। যে পাপের নাম পাকিস্তান।

লাশ ফেলার চার কর্মী

চুকনগরের কাওসার আলী, দলিল উদ্দিন, আনসার সরদার, ইনছার আলী সরদার এরা লাশ ফেলার কাজে অংশ নেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পে এরা সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন। কাওসার আলী বলেন, এলাকার ওহাব মেম্বার তাদের লাশ ভদ্রা নদীতে ফেলার কথা বলে। পাকিস্তানি সৈন্যরা আদেশ দিয়ে বলেছিল সব লাশ নদীতে ফেলে গ্রাম সাফ সুতরা করতে হবে। গ্রামের লোকজন সবাই মিলে লাশ ফেলার কাজে অংশ নেন। গ্রামজুড়ে দুর্গন্ধ বাড়ছিল। সেজন্য যত তাড়াতাড়ি লাশ ফেলা সম্ভব হবে তত তাড়াতাড়ি গ্রাম বাসযোগ্য হবে এটাই তখন তাদের চিন্তা ছিল। কাওসার আলীরা বলেন কত যে মানুষ মরেছে তার হিসাব দিতে পারব না। দশ-বারো হাজারের কম তো হবে না!

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রত্যয়

দু'দিনের ক্যাম্পে দু'শ'র বেশি প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে চুকনগর গণহত্যার ঘটনা সম্পর্কে। মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সমাপনী অনুষ্ঠানে বলেন—মুক্তিযুদ্ধ করেছে সাধারণ মানুষ। তারা হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুরতার শিকারও হয়েছে বেশি। কিন্তু বিজয়ের স্বাদ ভোগ করেছি আমরা শহরবাসী সুবিধাভোগী শ্রেণী। মুক্তিযুদ্ধের

বিজয় সাধারণ মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। সেজন্যই গবেষণা ইনস্টিটিউট এ ধরনের কাজে হাত দিয়েছে। মুনতাসীর মামুন বলেন—দু'দিনের ক্যাম্পে স্বজন হারানো লোকজন নানা কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন—আমরা কোন দিন কারও কাছে কিছু চাইনি। কিন্তু আমাদের কথা কেউ কোন দিন শুনতেও আসেনি। আমরা মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পের মাধ্যমে নতুন জানার এক জগত উন্মোচন করেছি। এক্ষেত্রে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৃণমূল পর্যায়ের ইতিহাস চর্চা কেন্দ্রের ভূমিকার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন—ভিয়েতনামের মাইলাই গণহত্যাকাণ্ডের বর্বরতাকেও হারিয়ে দিয়েছে চুকনগরের ঘটনা। এতদিন এ ঘটনাকে জাতির সামনে তুলে ধরতে না পেরে আমরা অপরাধই করেছি। পাপ স্খলনের যে সুযোগ সামনে এসেছে তা কাজে লাগাতে হবে। বিশেষ অতিথি অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন—আজ যারা ৪৭'এর চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলে তারাই চুকনগর, গল্লামারীর গণহত্যার জন্য দায়ী। এদের বিচার করতে হবে। আমরা বিচারের সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। তাদের বিচার হবেই কারণ তারা মানুষ খুন করেছে। শত্রুর সঙ্গে কোন আপোস, সহঅবস্থান হবে না। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দিয়েই আমরা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শত্রুদের প্রতিরোধ, পরাজিত করব। চুকনগরের শহীদ পরিবারের সদস্য আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়নের এমপি নগেন্দ্র নাথ গায়েন বলেন—চুকনগরে দেশের সবচেয়ে বড় স্মৃতিসৌধ হওয়া উচিত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক নুরুল হোসেন চৌধুরী বলেন, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জাতীয় দিবসে সম্মানিত করা হয়। আমাদের এখানে তেমন দিনে সম্মানিত ব্যক্তিদের আমরা খোঁজও রাখি না। অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান বলেন, চুকনগর ক্যাম্প দিয়ে বহুদিন পর আমরা একটি ভাল কাজ করতে পেরেছি। ইনস্টিটিউটের উপ-অধিকর্তা মোহাম্মদ সেলিম বলেন—গণহত্যার বিচারের জন্য সংগৃহিত দু'শতাধিক সাক্ষাতকার মূল্যবান দলিল হয়ে থাকবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক রোজিনা কাদের বলেন—আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশিত বইগুলো মূলত সামরিক কর্তাদের বীরত্বের কাহিনী। সেখানে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের ত্যাগের ইতিহাস স্থান পায়নি। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এসএম নজরুল ইসলাম বলেন, মুক্তিযুদ্ধের তৃণমূল পর্যায়ের ইতিহাস অনুসন্ধানে তাঁরা তাঁদের চলতি ভূমিকা অব্যাহত রাখবেন। দু'দিনের ক্যাম্প শেষে গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীরা ফিরে গেছেন স্ব স্ব এলাকায়। যাবার আগে তাঁরা বলে গেছেন নিজেদের কৃতজ্ঞতার কথা। বলে গেছেন বহুদিন পর মনে হলো আমরা দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছিলাম। আমাদের স্বজন হারানোর দুঃখ আমরা মন খুলে বলতে পেরেছি। এমন বলার সুযোগের অপেক্ষায় আমরা বেঁচেছিলাম। সমাপনী অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রকাশনাসমূহ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উপহার দেয়া হয়।

যুদ্ধ আমাকে পঙ্গু করেছে চাকরিও যদি একটা পেতাম

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ॥ নমিতার কপালে সুখ আসেনি। একাত্তরে চুকনগরে গণহত্যার দিন নমিতার দু' পায়ে গুলি লেগেছিল মোট ৬টি। আড়াই বছরের নমিতা মায়ের কোলে ছিল তখন। রক্তে ভিজে গিয়েছিল শিশু নমিতার সারা শরীর। রক্তাক্ত শিশুকে নিয়ে বাবা মধুসূদন তরফদার, মা আনারতি তরফদার দেশ ছেড়েছিলেন। ভারতে তার ভাল চিকিৎসাও হয়েছিল। কিন্তু নমিতার পঙ্গুত্ব যায়নি। শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়নি। স্বাধীন দেশে এখন ত্রিশের বেশি বয়স নমিতার। বিয়ে সংসার হয়নি। বিয়ের আলাপের সঙ্গে যৌতুকের মোটা দাবি আসে। দুই বিঘা জমি এবং নগদ টাকা। এত বড় দাবি মেটানোর ক্ষমতা নমিতার অভিভাবকের নেই। শনিবার নমিতা জনকণ্ঠকে বলেছে, যুদ্ধ আমাকে পঙ্গু করেছে। চাকরিও যদি একটা পেতাম তাহলে যৌতুকলোভী কারও হাতে নিজেকে বিক্রি হতে দিতাম না। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে শনিবার কথা হয় নমিতার সঙ্গে। বললেন, চুকনগরের ঘটনা তো আমার মনে নেই। যা শুনেছি মা বাবার মুখেই শুনেছি। ভারতে বিহারের গয়া'র হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীও হাসপাতালে আমাকে দেখতে আসেন। যুদ্ধের পুরো সময় কেটেছে হাসপাতালের শয্যায়। দেশে এসেও অনেকদিন হাঁটতে পারিনি। এখনও বেশি সময় হাঁটতে পারি না। ভারি কাজকর্ম করতে পারি না। ১৯৮৭ সালে বটিয়াঘাটা পাইলট স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন নমিতা। এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পাস করতে পারেননি। তাঁর বড় ভাই বলেন নমিতার মানসিক বিকাশেও সমস্যা হয়ে গেছে। স্কুলে পড়ার সময় বান্ধবীদের স্বাভাবিক হাসিখুশির জীবন দেখে দেখে তাঁর মানসিক সমস্যা আরও বাড়ে। মা আনারতিও এসেছিলেন নমিতার সঙ্গে। মেয়ের সমস্যা জানতে চাইলে মা বিয়ের প্রসঙ্গ তোলেন। এমন মেয়ে কেউ তো বিয়ে করতে চায় নারে বাপ। বেশি বেশি যৌতুক চায়। এত টাকা পাব কোথায়। নমিতা তখন বিস্ফোরিত হন। যুদ্ধের স্মৃতি তার শরীরে। এখন আবার পড়েছেন সামাজিক সমস্যার মুখে। বললেন এমন বিয়ের দরকার নেই। একটা চাকরি যদি পেতাম নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতাম। কারও দয়ার দরকার পড়ত না। মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে চুকনগরে বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে এই একজন নমিতাকে আলাদা করা যায়। নিষ্পাপ শিশু বয়সে সে শিকার হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার। আর এখন সামাজিক নৃশংসতার শিকার নমিতার দুঃখভরা মুখটি এখন বিষণ্ণতায় ঢাকা পড়ে থাকে। দেশ স্বাধীন হলেও যে নৃশংসতা থেকে সমাজ নমিতাকে মুক্তি দিল না, এই সমাজের কাছে কোন দয়া দাক্ষিণ্যও চায় না সে। চায় শুধু একটি কাজ। সম্মানসহ বেঁচে থাকার মতো একটি কাজ যুদ্ধের বিজয়ী দেশে সুবিধাভোগীরা আজও যেটি দিল না নমিতা তরফদারকে।

খুলনার চুকনগরে গণহত্যায় প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য
৬ ঘণ্টায় ১০ হাজার বাঙালিকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী

জুলফিকার আলি মাণিক, খুলনা থেকে : পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী খুলনার চুকনগরে ৫/৬ ঘণ্টায় নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছিল প্রায় ১০ হাজার নিরীহ বাঙালিকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় '৭১ সালে ২০ মে দিনের বেলা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যরা এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঘটায়। সেই দুঃসহ স্মৃতিবহ চুকনগর বধ্যভূমিতে ভয়াবহতম গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে বের হয়ে এসেছে এই মর্মন্তুদ তথ্য।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট'-এর উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার থেকে চুকনগর বধ্যভূমিতে গণহত্যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষীদের দু'দিনব্যাপী জবানবন্দী গ্রহণ শুরু হয়েছে। চুকনগর বধ্যভূমিতে শহীদদের পরিবারের সদস্য, আহত অবস্থায় বেঁচে থাকা এবং গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী এমন প্রায় ১০০ জন নারী-পুরুষের সাক্ষ্য গতকাল গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ ৩০ বছর পর স্মৃতি খুঁড়ে মুক্তিযুদ্ধের এই করুণ ইতিহাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেক নারী-পুরুষ বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েন। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার ৩০ বছরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গণহত্যার সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের উদ্যোগ এটাই প্রথম।

মূলত খুলনা জেলার বিভিন্ন থানা ও গ্রাম থেকে হাজার হাজার নারী, পুরুষ, শিশু মুক্তিযুদ্ধের সময় চুকনগর হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য যাচ্ছিল। এ সময় মে মাসের ২০ তারিখে গোটা চুকনগরে প্রায় ১ লাখ শরণার্থীর অবস্থান ছিল বলে অনেক সাক্ষী তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করে বলেছেন। সেদিনই সকাল ১০টার পর সাতক্ষীরার সড়ক হয়ে আসা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল চুকনগরে এসে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার শরণার্থীর ওপর নির্বিচারে গুলি করতে শুরু করে। বিকাল ৪টা পর্যন্ত গোটা চুকনগরে শরণার্থীদের এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর টানা গুলি বর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ চলে। সকলে দিগ্বিদিক ছুটে পালানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করলেও এরই মধ্যে অগণিত মানুষের লাশের স্তূপে পরিণত হয়েছিল চুকনগর।

এই গণহত্যাযজ্ঞে নিহতদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা সম্ভব না হলেও যারা চুকনগর জুড়ে সেদিন লাশের পর লাশ দেখেছিল, তাদের অনেকের ধারণা ন্যূনতম পক্ষে ৬ থেকে ১০ হাজার নিরীহ বাঙালি সেদিন হত্যা করেছিল পাকিস্তানি নরপশুরা। আবার কোনো কোনো প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, চুকনগর বধ্যভূমিতে সেদিন নিহতের সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশি হবে। এমন কয়েকজন ব্যক্তির জবানবন্দী পাওয়া গেছে যারা গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার পর নিজ হাতে লাশ তুলে তুলে ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীর জলে। নদী গর্ভে লাশ ফেলার কাজ করেছেন এমন

কিছু ব্যক্তি তখন ৪ হাজার ২০০টি লাশ গুনেছেন। তারপরও অগণিত লাশের স্তূপ ছিল চুকনগরে।

'মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প : চুকনগর' নামে চুকনগর বধ্যভূমিতে গণহত্যার সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের দু'দিনব্যাপী এই কর্মসূচির আজ শেষ দিন। গতকাল প্রথম দিন সকালে গণহত্যার তথ্য সংগ্রহের একটি সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় চুকনগর কলেজ মাঠে। সেখানে ঢাকা থেকে আসা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ, মুক্তিযুদ্ধের এই ইতিহাস সংগ্রহের উদ্যোক্তারা তাদের বক্তব্যে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য একাত্তরে তাদের দুষ্কর্মের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, 'আমাদের দায়িত্ব ইতিহাস সংগ্রহ করা। ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা শত্রুকে পরাজিত করবো। তিনি একাত্তরের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আল-শামসদের পরিচালিত গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে বলেন, যারা সভ্যতাকে জবাই করেছে তাদের বিচার হতেই হবে। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে নয়, সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই এ বিচার চাই।'

অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর আরো বলেন, 'পাকিস্তান একটি পাপ। এই পাপের সঙ্গে যারা সহযোগিতা করেছে তারা আজকে একজোট হয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে উৎখাত করার জন্য, মুক্তিযুদ্ধকে নষ্ট করার জন্য। তাদের সঙ্গে আমরা কিছুতেই সহযোগিতা করবো না। যেখানেই পাপ, সেখানেই আমাদের প্রতিরোধ। ইতিহাসের মাধ্যমে পাপকে প্রতিহত করবো। যারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ একটি সাময়িক ঘটনা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবাদ।'

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, স্বৈরাচার কত ভয়াবহ, সামরিক শাসন কতো বর্বর জিনিস সেই শিক্ষা আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে পেয়েছি।' আর কখনই নতুন করে যেন আমরা স্বৈরাচারের কবলে না পড়ি, গণতন্ত্রকে যেন বিঘ্নিত হতে না দেই এ জন্য তিনি সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

স্বাগত ভাষণে মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবৈতনিক পরিচালক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন গণহত্যার তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করা হবে। চুকনগরের 'মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প' দিয়ে এই কাজে যাত্রা শুরু, কারণ উল্লেখ করে বলেন, দেশে চুকনগরের গণহত্যাটি সবচেয়ে বড়ো গণহত্যা। ৪/৫ ঘণ্টায় ৬ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। অথচ চুকনগরের গণহত্যার বিষয়টি ইতিহাসে কখনো তেমন করে আসেনি। তিনি বলেন, এ ছাড়াও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হলে এ ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগাড় করে রাখতে হবে।

চুকনগর কলেজের অধ্যক্ষ এবিএম শফিকুল ইসলাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণে বলেন, '৭১-এর ২০ মে চুকনগরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যায় ১০ হাজারের মতো লোক নিহত হয়। অথচ স্বাধীনতার রচিত ইতিহাসে এই গণহত্যার স্থান হয়নি, যা দুঃখজনক। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, তৃণমূল পর্যায়ে ইতিহাস চর্চা, খুলনা কমিটির আহ্বায়ক শচিন্দ্রনাথ মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাজহারুল হান্নান প্রমুখ।

চুকনগর কলেজের মাঠে খোলা আকাশের নিচে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সঙ্গেই ছিল বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত, তারপর গ্রাম, কাছেই বাজার এলাকা, যার পুরোটাই বধ্যভূমি। কলেজের ভবনে আয়োজন করা হয় মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর। সন্ধ্যায় দেখানো হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। খুলনার দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ এ নতুন ধরনের ইতিহাস সংরক্ষণের কাজ দেখতে ভিড় জমান।

চুকনগর গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা গাছে উঠে, পানিতে ডুব দিয়ে থেকেও প্রাণ বাঁচাতে পারেনি বহু মানুষ

জুলফিকার আলি মাণিক, খুলনা : গাছে উঠে, পানিতে ডুব দিয়েও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে প্রাণ রক্ষা করতে পারেনি অগণিত মানুষ। খুলনার চুকনগরে মুক্তিযুদ্ধের সময়, একাত্তর সালের ২০ মে পাকিস্তানি সেনারা নিরীহ বাঙালিদের ওপর যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায় সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্তদের বর্ণনা থেকে বেরিয়ে এসেছে এই মর্মস্পর্শী তথ্য।

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর খুলনা ও বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাণভয়ে হাজার হাজার মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল। যাত্রাপথে চুকনগরে সেদিন অগণিত মানুষ সাময়িক বিশ্রামের জন্য অবস্থান করে। তাদের সিংহভাগই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধও ছিল।

গত ২ দিন ধরে (শুক্র ও শনিবার) চুকনগরের সেই ভয়াবহতম হত্যাযজ্ঞের তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট'-এর উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দী গ্রহণ চলছে। ইনস্টিটিউটের 'মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প : চুকনগর' নামে গণহত্যার এই সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের কর্মসূচি শেষ হয়। ২ দিনে দুই শতাধিক নারী-পুরুষের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কিভাবে পাকিস্তানি সেনারা 'পশু-পাখির মতো' সেদিন চুকনগরে হত্যা করেছিল প্রায় ১০ হাজার বাঙালিকে। চকরিয়া কলেজের অধ্যাপক গোপাল কৃষ্ণ সরকার সেই ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের

একজন প্রত্যক্ষদর্শী। ডুমুরিয়া থানার বরাজি গ্রামের এই অধিবাসী জানান, পাকিস্তানি সেনাদের বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণে চুকনগরে ঠাঁই নেওয়া হাজার হাজার নিরীহ বাঙালি প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি শুরু করে। কেউ কেউ বড়ো বড়ো গাছে উঠে প্রাণভয়ে পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এতেও রক্ষা হয়নি। পাকিস্তানি বর্বর সেনারা পাখি শিকারের মতো নিচ থেকে গুলি করে হত্যা করে তাদের। একইভাবে অনেকে পুকুরে, জলাভূমিতে পানির নিচে ডুব দিয়েও প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। পাকিস্তানি নরপশুরা পানির মধ্যেই গুলি করে হত্যা করেছে তাদের। এমন বর্বরতার শিকার হয়ে নিহতদের একজন বটিয়াঘাটা থানার কাতিয়ানাংলা গ্রামের হরিভক্ত রায়। তিনিও ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ২ শিশুপুত্র ও স্ত্রীসহ গ্রাম ছেড়েছিলেন। হরিভক্তের স্ত্রী বৃদ্ধ পুষ্পরাণী রায় ও বড়ো ছেলে, যার বয়স তখন ৬/৭ বছর ছিল সেই প্রশান্ত রায় পানিতে গুলি করে হত্যা করার নির্মম ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। পুকুরের চারদিক ঘেরাও করেছিল পাকিস্তানি সেনারা। তারা পানির নিচ থেকে কেউ মাথা উঠালেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল। হরিভক্ত রায়ও বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টা হিসেবে নিঃশ্বাস নিতে পানির নিচ থেকে উপরে একবার মাথা তুলতেই পাকিস্তানি হানাদাররা গুলি করে। মাথায় গুলি লেগে মারা যান হরিভক্ত। তার ছেলে প্রশান্ত বলেন, হঠাৎ দেখি পানির নিচে বাবা আমার হাত ছেড়ে দিয়েছেন, পানিও লাল হয়ে গেছে।'

তিনটি পুকুরে কয়েক হাজার মানুষ পানির নিচে ডুবে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল বলে জানান পুষ্পরাণী। কিন্তু গুলিতে এর বেশির ভাগই মারা গেছে। অনেকে পানিতে ডুবেই মারা গেছে।

পুষ্পরাণী ছাড়াও স্বরস্বতী রায় নামে আরেক বৃদ্ধা, যার স্বামীও চুকনগরের পুকুরের পানিতে ডুবেও প্রাণ রক্ষা করতে পারেনি। তাদের বর্ণনায় জানা গেছে, পুকুর ঘেরাও করে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের ভয়ে পানির নিচে ডুব দিলেও শিশুরা উঠে বারবার চিৎকার করার চেষ্টা করতো। তাদের কান্নার শব্দে বিপদের আশঙ্কায় অনেকে জোর করে মুখ ও মাথা চেপে শিশুদের পানির নিচে ডুবিয়ে রাখে। তখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অনেকে এমনকি কিশোর-কিশোরী, নারী-পুরুষও মারা গেছে। পাকিস্তানি হানাদাররা গুলিতে আহত কাতরাতে থাকা মানুষদের বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে। তাদের গুলির আঘাতে রক্তাক্ত খোঁড়া পা নিয়ে নদী পার হতে গিয়ে ডুবে গিয়েছে অনেকে। এ ছাড়াও নৌকা নিয়ে পালানোর সময় নৌকা ডুবে পানিতে মারা গেছে অনেকে।

চুকনগর বধ্যভূমিতে পাকিস্তানি নরপশুদের হত্যাযজ্ঞের লোমহর্ষক এমনি খণ্ড খণ্ড বহু বর্ণনা বেরিয়ে এসেছে ভুক্তভোগী, প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দী থেকে।

ভোরের কাগজ ১০ সেপ্টেম্বর ২০০০

একাত্তরের সেইসব ভয়ঙ্কর স্মৃতি চুকনগরে ঘটেছিল পৃথিবীর একক বৃহত্তম নরহত্যাযজ্ঞ!

জুলফিকার আলি মাণিক/গৌরাঙ্গ নন্দী : লুটেরাদের অত্যাচারে ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে তারা ছুটে পালাচ্ছিল। লক্ষ্য ছিল সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশটিতে ঠাঁই নেওয়া। পলায়নরত ভীত সন্ত্রস্ত এই মানুষগুলোকে পাকিস্তানি হানাদাররা নির্বিচারে হত্যা করেছিল চুকনগরে। মর্মান্তিক এ হত্যাকাণ্ডটি ঘটে একাত্তর সালের ২০ মে। এর আগের দিন বটিয়াঘাটার ফুলতলায় ঘটে এমনি এক হত্যাকাণ্ড। দু'দিন পর ২৩ মে ঘটে ঝাউডাঙ্গায় হত্যাকাণ্ড।

এসব মর্মান্তিক, হৃদয়স্পর্শী করুণ গাঁথার তথ্য বেরিয়ে এসেছে একাত্তরের হায়েনাদের কবল থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষের কাছ থেকে। স্বজন হারানো এসব মানুষের মুখ থেকে সেসব বীভৎস দিনগুলোর কথা জানার উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট'। গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর তারা দু'দিনের ক্যাম্প বসিয়েছিল খুলনা অঞ্চলে।

বর্তমানে বটিয়াঘাটা কলেজে চাকরি করেন রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। তার বাড়ি বটিয়াঘাটার মাইনমারা গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ছিলেন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। হানাদারদের কবল থেকে বেঁচে যাওয়া এই ব্যক্তি সেদিনের দুঃসহ স্মৃতি খুঁড়ে নানা কথা বলেন। তিনি বলেন, এপ্রিল মাসের শেষদিক থেকেই তাদের এলাকাসহ আশপাশের গ্রামগুলোতে নানা ঘটনা ঘটতে শুরু করে। ডাকাতি, লুটতরাজ, হত্যা। যতোই দিন পেরুতে থাকে ততোই এই অসহনীয় পরিস্থিতি তীব্রতর হতে থাকে। অসহ্য হয়ে ওঠে এলাকার পরিবেশ। প্রতিরোধের পরিবর্তে পালিয়ে আত্মরক্ষা করাই শ্রেয় মনে করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, নিজেদের বসতভিটায় আবার ফিরে আসতে পারবে এ ভাবনা তখন অনেকের ছিল না। এ কারণে জমি না হলেও অনেকেই অস্থাবর সহায়-সম্পদ বিক্রি করে দেশ ত্যাগ করতে শুরু করে। সামান্য দামেই বিকিয়ে দিতে থাকে সারা জীবনের অর্জিত সম্পদ। মে'র প্রথম সপ্তাহ থেকে বহিরাগতদের হামলা, প্রকাশ্যে সহায়-সম্পদ কেড়ে নেওয়া, লুটতরাজ ও গানবোটে করে পাক সেনাদের হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ মানুষদের চরম আতঙ্কে ফেলে দেয়। বাড়িঘর ছেড়ে মানুষ জীবন নিয়ে পালাতে থাকে।

একাত্তরের ১৯ মে বুধবার সকালবেলার আক্রমণ এই আতঙ্কিত আরো ভয় পাইয়ে দেয়। সেদিন গানবোটে আসা পাক হানাদাররা ফুলতলা গ্রামটি জ্বালিয়ে দেয়। হত্যা করে কমপক্ষে শতাধিক নারী-পুরুষ শিশুকে। এ ঘটনায় বিমূঢ়, হতবিহ্বল রবীন্দ্রনাথের পরিবার আরো অনেক পরিবারের মতো সেদিনই ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতের উদ্দেশে পাড়ি দেয়।

খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার সীমান্তবর্তী ভদ্রা নদীর কোলঘেঁষা চুকনগরেই রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য হাজার হাজার পরিবার ১৯ তারিখে রাত কাটায়।

খুলনা জেলাধীন ডুমুরিয়া থানার এই চুকনগরে পরদিন ২০ মে ঘটে সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে একক বৃহত্তম নরহত্যাযজ্ঞ। বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ শুরু হওয়া এ বর্বরতম হত্যাযজ্ঞটি ঘটে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত। গুলি বেয়নেটের আঘাত ও নদীপথে নৌকাযোগে পলায়নরত নর-নারী-শিশুর সলিল সমাধিতে কতো মানুষের মৃত্যু ঘটে তার সঠিক হিসাব কেউ বলতে পারে না। তবে এ সংখ্যা কোনোক্রমেই ১০ হাজারের নিচে নয়, বরং বেশি বলেই মন্তব্য করেন রবীন্দ্রনাথ।

বটিয়াঘাটার মাইনমারা গ্রামের তিনজন মারা যায় সেদিন চুকনগরে। এরা হচ্ছে—নকুল, বিরাজ মিস্ত্রি ও কুঞ্জিলাল। পাশের গ্রাম আউশখালির ১৪ জন মারা যায়। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের পরিবার। কারণ তারা সেদিন সকাল ৯টার দিকেই চুকনগর ছেড়ে গিয়েছিল। ...

চুকনগর ছিল প্রকৃতপক্ষে পলায়নরত মানুষের ট্রানজিট। বটিয়াঘাটা, দাকোপ, বাগেরহাট, পিরোজপুর, মংলা, মোড়লগঞ্জ থেকে প্রাণভয়ে পালানো ভীতসন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো বেশিরভাগ নদীপথে নৌকাযোগে, কেউ সড়কপথে ছুটছিল ভারতের দিকে।

শরণার্থীদের এই মিছিলের আর একটি যাত্রা বিরতির স্থান ছিল সাতক্ষীরার ঝাউডাঙ্গা। চুকনগরের নৃশংস ঘটনার দু'দিন পর ২৩ মে এখানে হায়েনাদের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালি নর-নারী-শিশুর ওপর। সেখানেও প্রাণ দিয়েছিল হাজারখানেক মানুষ।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০০

১৯৭১ সালের ২০ মে খুলনার চুকনগরে বাংলাদেশের বৃহত্তম গণহত্যা সংঘটিত হয়। সেই দিনেই দশ হাজার নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ ঘটনাটি অনুল্লিখিত। চুকনগর গণহত্যার ত্রিশ বছর পূর্তি স্মরণে *বাংলাদেশ চর্চা* এই গ্রন্থটি প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে আমরা যাঁদের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছি তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করছি এবং একই সাথে গণহত্যার দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করছি।

ISBN 984 606 001-7
9 789846 060010